সাংখ্য দর্শন

মহর্ষি কপিল এই দর্শনের প্রণেতা। ইনি কহেন যে ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই অত্যন্ত পুরুষার্থ।

ত্রিবিধ দুঃখ যথা,—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দুঃখ দ্বিবিধ—শারীর ও মানস। আধিভৌতিক দুঃখ মনুষ্য, পশু, পক্ষী ও স্থাবরাদি ভূত পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়। আধিদৈবিক দুঃখ বন্যা, খরা, ভূমিকম্প প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হয়।

জগতে আসিয়াই লোক এই ত্রিবিধ দুঃখের অধীন হইয়া পড়ে। পুরুষকার অবলম্বন করিলে কখন কখন কোনও প্রকার দুঃখের ক্ষণিক অবসান হয় বটে, কিন্তু তাহাকে পুরুষার্থ বা মোক্ষ বলা যাইতে পারে না। এই দুঃখ সমূহের চিরাবসান অর্থাৎ তাহাদিগের পুনরুৎপত্তির কারণ পর্য্যন্ত নাশ করাই পুরুষার্থ।

প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক জ্ঞানই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির কারণ। কিন্তু এই বিবেক-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে পুরুষ ও প্রকৃতির স্বরূপ ও কার্য্য এবং জগৎ কি ও তাহার কারণ কি ইত্যাদি জানিতে হইবে। এই নিমিত্ত সাংখ্যকার পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অবতারণা করিয়া সমস্ত বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

পরিদৃশ্যমান জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা জড় ও চৈতন্য এই দুই পদার্থ দেখিতে পাই। চৈতন্য পদার্থ পুরুষ এবং জড় পদার্থ প্রকৃতি নামে অভিহিত হয়। এই দুই পদার্থই অনাদি, কিন্তু উভয়ে ভিন্নধর্ম্মী। সাংখ্যমতে পুরুষ বহু, কিন্তু কোনওপ্রকার প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না।

প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ব; মহৎ হইতে অহঙ্কার; অহঙ্কারের সাত্বিক অংশ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং অহঙ্কারের তামস ভাব হইতে পঞ্চ তন্মাত্রা —শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এবং তাহা হইতে পঞ্চ মহাভূত যথা, ক্ষিতি/পৃথিবী, অপ/জল, তেজ/অগ্নি, মরুৎ/বায়ু ও ব্যোম/আকাশ—সৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের তিনটি প্রকার-ভেদ আছে, যথা, (১) প্রকৃতি, (২) প্রকৃতি ও বিকৃতি উভয় ভাবাপন্ন, (৩) এবং বিকৃতি। প্রকৃতি শব্দে কারণ বুঝায়। মূল প্রকৃতি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের কারণ অথচ নিজে কাহারও কার্য্য নহে, অতএব ইহা কেবলই কারণ ভাবাপন্ন। কিন্তু মহত্তত্ব প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন অথচ অহঙ্কারের কারণ, অতএব ইহা প্রকৃতি ও বিকৃতি উভয় ভাবাপন্ন। আবার যে সমস্ত তত্ত্ব হইতে অপর কোনও প্রকার তত্ত্ব উদ্‌ভূত হইতেছে না তাহারা কেবলই বিকৃতি ভাবাপন্ন।

কিন্তু পুরুষতত্ত্ব প্রকৃতি বা বিকৃতি ভাবাপন্ন নহে। পুরুষ কোনও কারণ হইতে উদ্‌ভূত হয় নাই এবং পুরুষ হইতে কোনও কিছু উদ্‌ভূত হয় না।

প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ আছে; কিন্তু পুরুষ নির্গুণ। প্রকৃতির রজোগুণ দ্বারা সৃষ্টি, সত্ত্বদ্বারা স্থিতি ও তমঃ দ্বারা প্রলয় হইয়া থাকে। সৃষ্টি শব্দের অর্থ আবির্ভাব এবং প্রলয় শব্দের অর্থ তিরোভাব।

প্রকৃতির স্থূল ক্রিয়া দ্বারা যখন জগৎ স্থূল-রুপ ধারণ কবে তখনই ইহার আবির্ভাব এবং যখন প্রকৃতির সূক্ষ্মক্রিয়া দ্বারা জগৎ সূক্ষ্মভাবাপন্ন হয় তখনই ইহার তিরোভাব। বস্তুতঃ ইহার একেবারেই ধ্বংস নাই।

প্রকৃতিতে সৃষ্টির প্রবৃত্তি ও ভোগের উপাদান আছে। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি ও ভোগ হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতিই **ভোক্তি ও কর্ত্রী**; পুরুষ ভোক্তাও নহেন কর্ত্তাও নহেন। পুরুষ প্রকৃতিতে আসক্ত হইয়া কর্ম্মীরূপে প্রতীয়মান হয়।

“অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহং ইতি মন্যতে।”

অহঙ্কার বিমূঢ় ভাবই দুঃখের কারণ। অতএব পুরুষ যখন বিদ্যা আশ্রয় পূর্ব্বক অহং তত্ত্বের উপরে উঠিয়া স্বরূপে অবস্থিত হয়, তখন প্রকৃতির তিনগুণের সাম্যাবস্থা হয়।

প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক জ্ঞান সম্বন্ধে আরও কিছু স্পষ্ট করিয়া লিখিত হইতেছে। পুরুষ যদিও নিঃসঙ্গ, নিষ্ক্রিয় এবং নির্গুণ, তথাপি অদৃষ্টবশতঃ অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া নিজের দুঃখের বীজ নিজে রোপন করেন। কর্ম্মফল হইতে অদৃষ্টের উৎপত্তি। দর্শনকারগণ বলেন যে কর্ম্মের প্রথম নাই কারণ সৃষ্টি অনাদি, অতএব পুরুষের অদৃষ্টও অনাদি। কিন্তু অনাদি হইলেও সাংখ্যমতে কর্ম্মফল সান্ত। জ্ঞান কর্ম্মফলের ধ্বংস করিতে পারে। কর্ম্মফলের ধ্বংস হইলেই প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ নষ্ট হইবে। তাহা হইলেই মুক্তি। এক্ষণে এই প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ ধ্বংসকারী জ্ঞান কি? “নিজ স্বরূপ বোধ।” প্রকৃতিই সমস্ত ভোগের আধার ও বোধক, নিজে সমস্ত ভোগ হইতে পৃথক, এইরূপ জ্ঞান দ্বারা নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারিলে আর কর্ম্মফলে বাধ্য হইতে হয় না। সাংখ্য মতাদর্শীদের মতে, তত্ত্বের সংখ্যা পঞ্চবিংশতি বা পঁচিশ। এই পঁচিশটি তত্ত্বের যথার্থ জ্ঞানের মাধ্যমে জীবের মুক্তি বা মোক্ষলাভ হয়। সংখ্যাভিত্তিক এই দর্শন বলে এই দর্শনের নামকরণ করা হয়েছে সাংখ্যদর্শন। সাংখ্যদর্শনে প্রতিপাদ্য বিষয়কে ‘তত্ত্ব’ নামে অভিহিত করা হয়। এর মূলে রয়েছে নিত্য প্রকৃতি ও নিত্য পুরুষ নামক দুটি তত্ত্ব। এই **প্রকৃতি ও পুরুষের** সংযোগে সৃষ্টি হয় তেইশ প্রকার তত্ত্ব। এগুলো হলো-

মহৎ বা বুদ্ধি/intellect – অহঙ্কার/ego – মন/mind -
পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়/cognition organ :
(চক্ষু/eye, কর্ণ/ear, নাসিকা/nose, জিহ্বা/toung ও ত্বক/skin)
পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়/action organ :
(বাক্/speech, পাণি/hand, পাদ/feet, পায়ু/excretory organ, উপস্থ/genitus)
পঞ্চসূক্ষ্মভূত/পঞ্চতন্মাত্র/five subtle senses :
(শব্দ/sound, স্পর্শ/touch, রূপ/form, রস/teste ও গন্ধ/smell)
পঞ্চমহাভূত/five nature of universe : (ক্ষিতি/পৃথিবী/earth, অপ/জল/water, তেজ/অগ্নি/fire, মরুৎ/বায়ু /air ও ব্যোম/আকাশ/ether)

এই মতাদর্শীদের কেউ কেউ মনে করেন- 'সাংখ্য' হলো এখানে সম্যক–জ্ঞান (সাং+খ্য = সম্যক+জ্ঞান) বা যথার্থ জ্ঞান। সাংখ্যমতে সমুদয় জ্ঞান দুই প্রকার। এর একটি **তত্ত্বজ্ঞান**, অপরটি **ব্যবহারিক জ্ঞান**। তত্ত্বজ্ঞানকে এই দর্শনে 'বিবেকজ্ঞান' বলা হয়। বিবেকজ্ঞানের মাধ্যমেই জীবের দুঃখনিবৃত্তি হয়। যেহেতু এ দর্শনে বিবেকজ্ঞানকেই মোক্ষের হেতু বলা হয়েছে, তাই এ দর্শনকে সাংখ্যদর্শন বলা হয়। এই মতে আত্মা বা পুরুষ নানা ধরনের মোহ দ্বারা আব্দ্ধ হয়ে পড়ে। এই মোহ থেকে মুক্তি হওয়াই মোক্ষ লাভ। এই দর্শনে কার্যত সকল জীবই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক– দুঃখভোগ করে। মানুষ এই ত্রিবিধ দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায়ের সন্ধান করেছে যুগ যুগ ধরে। এর সব কিছু থেকে দিতে পারে তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেকজ্ঞান। বিবেকজ্ঞানের দ্বারা পরমপুরুষার্থ কৈবল্য লাভ হয়, এই কারণে এই জ্ঞান ঐকান্তিক জ্ঞান। অন্যদিকে এই জ্ঞান সকল দুঃখের নিবর্তক। তাই একে বলা হয় আত্যন্তিক জ্ঞান। আবার যমনিয়মাদি সাধ্য বলে এই জ্ঞান শুদ্ধ এবং এর দ্বারা লব্ধ মুক্তি অবিনাশী। তাই এই জ্ঞানকে অক্ষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সাংখ্য, বৌদ্ধ ও বেদান্ত দার্শনিকরা বিশ্বাস করেন যে, মোক্ষ প্রাপ্তির পর জীবের কোন দুঃখ থাকে না। কিন্তু সাংখ্য দার্শনিকরা এর বাইরে আরো মনে করেন যে, মোক্ষ বা মুক্তি কোনরূপ সুখ অনুভূতির অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে না। কারণ সুখ ও দুঃখ উভয়ই আপেক্ষিক শব্দ। যেখানে দুঃখ নেই সেখানে সুখ থাকতে পারে না। সাংখ্যমতে মোক্ষের দুটি দিক। একদিকে মোক্ষ বা মুক্তি বলতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে বোঝায়। অন্যদিকে সাংখ্য দার্শনিকরা মোক্ষ বা মুক্তি সুখ–দুঃখের অতীত এক তৃতীয় অবস্থাকে মনে করেন।

ঋষি কপিল দুঃখে জর্জরিত মানুষের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে এই দর্শন দান করেছিলেন তাঁর শিষ্য **আসুরিকে**। আসুরির তাঁর শিষ্য **পঞ্চশিখ**কে এই জ্ঞান দান করেন। এরপর পঞ্চশিখ তাঁর শিষ্যদের তা দান করেন। ক্রমে এই শিষ্যদের মাধ্যমে সাংখ্যদর্শন ছড়িয়ে পড়ে। এই দর্শন অনুসারে **ঈশ্বরকৃষ্ণ** '**সাংখ্যকারিকা**' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। **এই গ্রন্থের মোট শ্লোকের সংখ্যা ৭২। এর ভিতরে ৭০টি শ্লোকে তত্ত্বটিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ কারণে এই সাংখ্যকারিকা গ্রন্থটি 'সাংখ্যসপ্ততি' নামেও পরিচিত।**

এখন পর্যন্ত এই গ্রন্থটিকেই সর্বপ্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ঈশ্বরকৃষ্ণ এই গ্রন্থের পরিচয় দিয়েছেন এই ভাবে-

এতৎ পবিত্রমগ্র্যাং মুনিরাসুরয়েহনুম্পয়া প্রদদৌ।
আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তে চ বহুধা কৃতং তন্ত্রম্ ।।
(সাংখ্যকারিকা–৭০)

কপিল মুনি দয়াপরবশ হয়ে এই পবিত্র ও সর্বোৎকৃষ্ট (জ্ঞান) আসুরিকে প্রদান করেন, আসুরিও পঞ্চশিখকে (এই জ্ঞান দান করেন) এবং তার (অর্থাৎ পঞ্চশিখ) দ্বারা সাংখ্যশাস্ত্র বহুভাবে শিষ্য মধ্যে প্রচার হয়েছিলো।

সাংখ্যকারিকার তত্ত্বসমূহ

সংখ্যাকারিক ১

সাংখ্যমতের তত্ত্বজ্ঞান

সাংখ্যমতে তত্ত্বজ্ঞানকে বিবেক জ্ঞান বলা হয়। জ্ঞানের দ্বারাই জীব দুঃখ থেকে চিরনিবৃত্তি লাভ করতে পারে। ব্যক্ত জগৎ, অব্যক্ত প্রকৃতি এবং জ্ঞ বা পুরুষের স্বরূপ অনুধাবনের মাধ্যমেই দুঃখের হাত থেকে জীবের চিরনির্বত্তি লাভ হতে পারে। লৌকিক বা বৈদিক কোন প্রকার কর্মের দ্বারাই জীবের মুক্তিলাভ হতে পারে না। এ বিষয়ে 'সাংখ্যকারিকা'র দ্বিতীয় শ্লোকে উল্লেখ আছে-

'দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ।।' (সাংখ্যকারিকা–২)

অর্থাৎ: বৈদিক যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপও লৌকিক উপায়ের মতো ত্রিবিধ দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি সাধনে অসমর্থ। সেই যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ যেহেতু অবিশুদ্ধি, ক্ষয় ও অতিশয়যুক্ত, সেহেতু যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের বিপরীত দুঃখ নিবৃত্তির সেই সাংখ্যশাস্ত্রীয় উপায় ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞান–ই শ্রেয়। কারণ ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ–এর বিবেকজ্ঞান থেকে দুঃখের অবশ্যম্ভাবী ও চির নিবৃত্তি হয়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে তত্ত্বের ২৫টি প্রতিপাদ্য আছে। এই কারণে তত্ত্বের সংখ্যাও ২৫টি ধরা হয়। এই তত্ত্বগুলোকে কার্যকারণের বিচারে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই ভাগগুলো হলো-

১. কেবল প্রকৃতি: একে বলা হয় মূল প্রকৃতি। মূল প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থায় থেক। তাই এই প্রকৃতি ত্রিগুণাত্বক। সকল কার্যই প্রকৃতির ভিতর অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। পরম প্রকৃতি উৎপত্তিহীন। এই প্রকৃতি এবং পুরুষের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় ২৩ প্রকার তত্ত্ব।

২. প্রকৃতি-বিকৃতি: মহৎ (বুদ্ধি), অহঙ্কার, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) এর দ্বারা নিত্য-প্রকৃতির বিকৃতি ঘটে। সাংখ্যমতে প্রধান প্রকৃতি থেকে মহৎতত্ত্বের উৎপত্তি হয়, মহৎতত্ত্ব থেকে অহংকারের উৎপত্তি হয়, অহংকার থেকে একাদশ ইন্দ্রিয় (মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়) ও পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হয় এবং পঞ্চতন্মাত্র থেকে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি হয়।

৩. বিকার বা কেবল বিকৃতি : এই তত্ত্ব কোন তত্ত্বের কারণ নয়। কিন্তু অন্য কোন তত্ত্বের কার্যরূপে বিকৃতি ঘটায়। মোট ১৬টি তত্ত্বকে বিকার বিকৃতি বলা হয়। এগুলো হলো পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্), পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্), পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ) এবং মন।

৪. নিষ্ক্রিয় তত্ত্ব: যে তত্ত্ব প্রকৃতিও নয় এবং অন্য কোন তত্ত্বের কার্য বা বিকৃতিও নয়। এই বিচারে পুরুষ হলো নিষ্ক্রিয় তত্ত্ব। সাংখ্যমতে পুরুষ কারও কার্য বা কারণ হয় না। তাই একমাত্র পুরুষই নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয় তত্ত্ব। মূলত চৈতন্য হলো পুরুষের স্বরূপধর্ম। পুরুষ হলো নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব। পুরুষের বন্ধনও নেই, মোক্ষও হয় না। পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ বলে তার দেখার বা জানার শক্তি রয়েছে, কিন্তু তার ক্রিয়াশক্তি নেই। প্রকৃতির রূপ দর্শনপুরুসাক্ষী হলেও স্বভাবতই পুরুষ উদাসীন। চেতন পুরুষ কর্তা নয় এবং কর্তার বুদ্ধিও চেতন নয়।

সাংখ্যমতে পুরুষ সর্বব্যাপী ও সংখ্যায় বহু। অবিবেক-বশত পুরুষ বদ্ধাবস্থাপ্রাপ্ত হয়। বদ্ধ পুরুষকে তাই অবিবেকী বলা হয়। পুরুষের অবিবেক বিনাশ্য এবং তা বিনাশের মাধ্যমে পুরুষ মোক্ষ বা কৈবল্য লাভ করে।

পুরুষ ও প্রকৃতি আদি তত্ত্ব। উভয়ই অকারণ, অলিঙ্গ এবং নিত্য। পুরুষ প্রকৃতির পরিপূরক। প্রকৃতিতে যার অভাব দৃষ্ট্য হয়, তাই পুরুষে থাকে। সাংখ্যমতে চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ যেমন সত্য, তেমনি জড় প্রকৃতিও সত্য। উভয়ই প্রপঞ্চময় জড়জগতের মূল ও আদি কারণ। এককভাবে কেউই জগতের কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। পুরুষের সংস্পর্শে প্রকৃতির যে পরিণাম ঘটে, তাই জগৎ। আবার প্রলয়কালে এই জগৎ অব্যক্ত প্রকৃতিতেই লীন হয়ে যায়। সাংখ্য মতাদর্শে প্রকৃতি পুরুষকে মোহিত করে। প্রকৃতি হলো নারীর অনুরূপ। সে তার সকাম হাস্য, লাস্য, ভাব, অনুভাবের মধ্য দিয়ে পুরুষকে মোহিত করে যৌনাকাঙ্ক্ষায়। এর মধ্য দিয়ে সন্তান নামক ফল লাভ করে। এই ফল সযত্নে লালন করে প্রকৃতি তথা নারী। সেখানে প্রকৃতি হয়ে উঠে মাতৃ স্বরূপা।

কার্য ও কারণ

কার্য ও কারণের মধ্য দিয়ে জগতের প্রকাশ। যা কিছু ঘটে বা যা কিছু উৎপন্ন হয় তার সবই কার্য বা কার্যের ফল। আর যা থেকে উৎপন্ন হয় তাই হলো কারণ। সাংখ্য মতে **কারণের দুটি প্রকরণ** রয়েছে, কারণ দুটি হলো **উপাদান ও নিমিত্ত।** উপাদান হলো- যা থেকে কোনো কার্য সৃষ্টি হয়। উপাদানকে কার্যের আশ্রয় বা অধিষ্ঠান বলা হয়। আর নিমিত্ত হলো- যে শক্তির দ্বারা কার্য সাধিত হয় এবং উপাদানকে আশ্রয় করে কার্য সম্পন্ন হয়। এই কার্য শক্তি বা নিমিত্তি কার্যের ফলফলের ভিতরে থাকে না। একটি মাটির কলসির মাটি হলো উপাদান, আর যে চক্রের সাহায্য কলসি তৈরি করা হয়েছে, তা হলো নিমিত্ত। আর মাটির কলসি হলো কার্য।

কার্যের উৎপত্তির পূর্বে কার্য-কারণ থাকে কিনা এ নিয়ে মতভেদ আছে। সৎকার্যবাদীরা বলেন কার্যকারণ ছাড়া কার্য হয় না এবং কার্যকারণ আগে থেকেই

থাকে। শুরুতে কার্য অব্যাক্তাবস্থায় থাকে। অন্য দিকে অসৎকার্যবাদীরা মনে করেন, কার্যের কার্যকারণ থাকে না। তাঁরা মনে করেন কার্য উৎপন্ন হওয়ার আগে কার্যের কোন অস্তিত্বই থাকে না, কার্য সম্পূর্ণভাবে নতুন সৃষ্টি বা আরম্ভ। সাংখ্যমতে কোনো কার্য উৎপন্নের আগের কার্য, কোনো না কোনো উপাদানকে আশ্রয় করে গড়ে উঠে। তাই আগের উপাদান সত্য, উৎপন্নের পরের উপাদানও সত্য। সাংখ্য মতে 'সতঃ সজ্জায়ত'। অর্থাৎ, সৎ বস্তু থেকে সৎ বস্তু উৎপন্ন হয়। সাংখ্যকারিকার নবম কারিকায় পাঁচটি যুক্তি এই বিষয়টিকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

'অসৎ অকরণাৎ উপাদানগ্রহণাৎ সর্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাৎ চ সৎ কার্যম্' ।।
(সাংখ্যকারিকা–৯)

অর্থাৎ: যা নেই তাকে উৎপন্ন করা যায় না, কার্য উৎপাদনে সমর্থ বস্তু থেকেই উৎপাদনযোগ্য বস্তু উৎপন্ন হতে পারে, যে কোন কিছু থেকে যে কোন কিছু উৎপন্ন হয় না, একটি বস্তু যে কার্য উৎপাদনে সমর্থ সেই বস্তুটি কেবলমাত্র সেই কার্যই উৎপাদন করে এবং কার্য স্বরূপত কারণ থেকে অভিন্ন বলে একটি কার্য উৎপত্তির পূর্বে তার উপাদান কারণে অস্তিত্বশীল থাকে।

গুণ: সাংখ্য দর্শনে **সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ** এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলা হয়েছে। এখানে গুণ হলো- জাগতিক যাবতীয় দ্রব্যের উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই গুণ দোষের বিপরীত শব্দ নয়। গুণ অপরের অর্থ বা প্রয়োজন সাধন করে। এই গুণগুলি **সুখ, দুঃখ ও মোহ** রূপে পাওয়া যায়। এরা পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব হলেও কার্যক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরের সহায়ক হয়।

গুণত্রয় পরিচয়

সত্ত্বগুণ: সুখাত্মক, লঘু, স্বচ্ছ ও প্রকাশক। এই গুণ ক্রিয়াহীন। সত্ত্বগুণকে শ্বেতবর্ণের সাথে তুলনা করা হয়।

রজঃগুণ: এই দুঃখাত্মক, উত্তেজক এবং ক্রিয়াশীল। জাগতিক সকল বস্তুর গতি, ক্রিয়া ও চঞ্চলতার জন্য রজোগুণই কারণ। রজগুণকে রক্তবর্ণের সাথে তুলনা করা হয়। এই গুণের প্রকাশ ঘটে প্রবৃত্তির ভিতর দিয়ে। তাই রজোগুণকে অন্য গুণের চালক বলা হয়। চলতে গিয়ে তমোগুণ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে রজোগুণ সকল বিষয়ে সমানভাবে কার্যকর হয় না।

তমঃগুণ: বিষাদাত্মক, গুরু এবং আবরক। এই গুণ সত্ত্বগুণের প্রকাশ এবং রজোগুণের প্রবৃত্তির নিবারণ করে। এই গুণ ক্রিয়াহীন। তমোগুণকে কালো বর্ণের সাথে তুলনা করা হয়।

সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বরভাবনা

প্রাচীন আধ্যাত্মবাদী বা ব্রহ্মবাদী দার্শনিকদের কাছে সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী বেদবিরোধী দর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। প্রাচীন সাংখ্য দার্শনিকদের মতে ঈশ্বর বলে কেউ নেই। প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ। এই মতবাদ স্থাপনের জন্য তারা ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিপক্ষে কতকগুলি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। সাংখ্যমতে পরিণামী প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ। ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার পক্ষে কোন যুক্তি নেই। যে কোনো কার্য সম্পাদনের পিছনে একটি উদ্দেশ্য থাকে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হলে জগৎ সৃষ্টির দ্বারা ঈশ্বরের কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে, এ কথা স্বীকার করতে হয়। এক্ষেত্রে জগৎ সৃষ্টির দ্বারা ঈশ্বরের কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে, তা জানা যায় না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করলে তাঁকে পুরুষ রূপেই স্বীকার করতে হয়। কিন্তু ঈশ্বর মুক্ত বা বদ্ধ কোন পুরুষ রূপেই স্বীকৃত হতে পারেন না। তিনি যদি বদ্ধ পুরুষ হন, তাহলে তিনিও দুঃখ–ত্রয়ের অধীন হবেন। কিন্তু ঈশ্বর কখনো দুঃখের অধীন হতে পারেন না। আবার ঈশ্বর যদি মুক্ত হন তাহলে তাঁকে নিত্য–মুক্তই বলতে হয়। তিনি যদি নিত্য–মুক্তই হন, তাহলে জগতের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না।

ভূমিকা

(ষড় দর্শন)

১/ সাংখ্য, ২/ যোগ, ৩/ ন্যায় ৪/ বৈশেষিক, ৫/ মীমাংসা, ৬/ বেদান্ত,

সাংখ্য দর্শনের গ্রন্থ সমুহ ও রচয়িতা

সাংখ্য দর্শনের মৌলিক **গ্রন্থ তিনটি**। **"তত্ত্ব সমাস"** গ্রন্থ এটায় আছে ২২ টি সুত্র; ঈশ্বরকৃষ্ণের **"সাংখ্য কারিকা"** ৭০ টি কারিকা; আর **"সাংখ্য প্রবচন সুত্র"** নামের একটি বৃহৎ সুত্র গ্রন্থ। বিশেষজ্ঞরা সাংখ্য প্রবচন সুত্র গ্রন্থটিকে অর্বাচিন বলে অভিহিত করেন, এই গ্রন্থের তেমন কোন দার্শনিক মূল্য নাই। এই তিনটি গ্রন্থ ছাড়া দুইটি টিকা গ্রন্থ আছে একটি,আজ (বাংলা ১৪৩০ সনের বৈশাখ মাস হইতে) ১৩০০ বছর আগে **বাঙালি দার্শনিক বিজ্ঞান ভিক্ষুর** সাংখ্য সুত্রের ভাষ্য। আমাদের ধারণা সাংখ্য দর্শন বাঙলায় উৎপত্তি হয়ে থাকতে পারে; বিজ্ঞান ভিক্ষুর ভাষ্য রচনাই এর একমাত্র কারণ নয় আরো কিছু কারণ আছে যার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। **সাংখ্য দর্শনের প্রবর্তক কপিল ঋষি।** কপিল শব্দের অর্থ তামাটে। সাংখ্য দর্শনের আরো অন্যান্য দার্শনিকদের নাম হচ্ছে আসুরি, পঞ্চশিখ, সনন্দ। আসুরি শব্দটা "অসুর" থেকে আসতে পারে যা সাংখ্য দর্শনের অনার্য উৎপত্তিকে নির্দেশ করে। এছাড়াও বাঙালি হিন্দুদের তর্পণ বিধিতে

সাংখ্য দার্শনিকদের তর্পণের ব্যবস্থা আছে যা বাঙালি ভিন্ন অন্য হিন্দু সম্প্রদায়ে নেই। যেমন,

“ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতন;
কপিলশ্চসুরিচৈব বোঢ়ঃ পঞ্চশিখস্তথা;
সর্বে তে তৃপ্তিমায়ান্ত মদ্দেত্তেনাম্বুনা সদা।“

ইনি কহেন যে ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই অত্যন্ত পুরুষার্থ।

ত্রিবিধ দুঃখ যথা,—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দুঃখ দ্বিবিধ—শারীর ও মানস। আধিভৌতিক দুঃখ মনুষ্য, পশু, পক্ষী ও স্থাবরাদি ভূত পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়। আধিদৈবিক বন্যা, খরা, ভূমিকম্প প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হয়।

জগতে আসিয়াই লোক এই ত্রিবিধ দুঃখের অধীন হইয়া পড়ে। পুরুষকার অবলম্বন করিলে কখন কখন কোনও প্রকার দুঃখের ক্ষণিক অবসান হয় বটে, কিন্তু তাহাকে পুরুষার্থ বা মোক্ষ বলা যাইতে পারে না। এই দুঃখ সমূহের চিরাবসান অর্থাৎ তাহাদিগের পুনরুৎপত্তির কারণ পর্য্যন্ত নাশ করাই পুরুষার্থ।

প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক জ্ঞানই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির কারণ। কিন্তু এই বিবেক-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে পুরুষ ও প্রকৃতির স্বরূপ ও কার্য্য এবং জগৎ কি ও তাহার কারণ কি ইত্যাদি জানিতে হইবে। এই নিমিত্ত সাংখ্যকার পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অবতারণা করিয়া সমস্ত বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

পরিদৃশ্যমান জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা জড় ও চৈতন্য এই দুই পদার্থ দেখিতে পাই। চৈতন্য পদার্থ পুরুষ এবং জড় পদার্থ প্রকৃতি নামে অভিহিত হয়। এই দুই পদার্থই অনাদি, কিন্তু উভয়ে ভিন্নধর্ম্মী। সাংখ্যমতে পুরুষ বহু, কিন্তু কোনওপ্রকার প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ব; মহৎ হইতে অহঙ্কার; অহঙ্কারের সাত্বিক অংশ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং অহঙ্কারের তামস ভাব হইতে **পঞ্চ তন্মাত্রা —শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ**—এবং তাহা হইতে পঞ্চ মহাভূত যথা, **ক্ষিতি/পৃথিবী, অপ/জল, তেজ/অগ্নি, মরুৎ/বায়ু ও ব্যোম/আকাশ** —সৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের তিনটি প্রকার-ভেদ আছে, যথা, (১) প্রকৃতি, (২) প্রকৃতি ও বিকৃতি উভয় ভাবাপন্ন, (৩) এবং বিকৃতি। প্রকৃতি শব্দে কারণ বুঝায়। মূল প্রকৃতি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের কারণ অথচ নিজে কাহারও কার্য্য নহে, অতএব ইহা কেবলই কারণ ভাবাপন্ন। কিন্তু মহত্তত্ব প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন অথচ অহঙ্কারের কারণ, অতএব ইহা প্রকৃতি ও বিকৃতি উভয় ভাবাপন্ন। আবার যে সমস্ত তত্ত্ব হইতে অপর কোনও প্রকার তত্ত্ব উদ্‌ভূত হইতেছে না তাহারা কেবলই বিকৃতি ভাবাপন্ন।

কিন্তু পুরুষতত্ত্ব প্রকৃতি বা বিকৃতি ভাবাপন্ন নহে। পুরুষ কোনও কারণ হইতে উদ্‌ভূত হয় নাই এবং পুরুষ হইতে কোনও কিছু উদ্‌ভূত হয় না।

প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ আছে; কিন্তু পুরুষ নির্গুণ। প্রকৃতির রজোগুণ দ্বারা সৃষ্টি, সত্ত্বদ্বারা স্থিতি ও তমঃ দ্বারা প্রলয় হইয়া থাকে। সৃষ্টি শব্দের অর্থ আবির্ভাব এবং প্রলয় শব্দের অর্থ তিরোভাব।

প্রকৃতির স্থূল ক্রিয়া দ্বারা যখন জগৎ স্থূল-রুপ ধারণ কবে তখনই ইহার আবির্ভাব এবং যখন প্রকৃতির সূক্ষ্মক্রিয়া দ্বারা জগৎ সূক্ষ্মভাবাপন্ন হয় তখনই ইহার তিরোভাব। বস্তুতঃ ইহার একেবারেই ধ্বংস নাই।

প্রকৃতিতে সৃষ্টির প্রবৃত্তি ও ভোগের উপাদান আছে। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি ও ভোগ হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতিই ভোক্ত্রী ও কর্ত্রী; পুরুষ ভোক্তাও নহেন কর্ত্তাও নহেন। পুরুষ প্রকৃতিতে আসক্ত হইয়া কর্ম্মীরূপে প্রতীয়মান হয়েন।

“অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহং ইতি মন্যতে।”

অহঙ্কার বিমূঢ় ভাবই দুঃখের কারণ। অতএব পুরুষ যখনবিদ্যা আশ্রয় পূর্ব্বক অহং তত্ত্বের উপরে উঠিয়া স্বরূপে অবস্থিত হয়েন তখন প্রকৃতির তিনগুণের সাম্যাবস্থা হয়।

প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক জ্ঞান সম্বন্ধে আরও কিছু স্পষ্ট করিয়া লিখিত হইতেছে। পুরুষ যদিও নিঃসঙ্গ, নিষ্ক্রিয় এবং নির্গুণ, তথাপি অদৃষ্টবশতঃ অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া নিজের দুঃখের বীজ নিজে রোপন করেন। কর্ম্মফল হইতে অদৃষ্টের উৎপত্তি। দর্শনকারগণ বলেন যে কর্ম্মের প্রথম নাই কারণ সৃষ্টি অনাদি, অতএব পুরুষের অদৃষ্টও অনাদি। কিন্তু অনাদি হইলেও সাংখ্যমতে কর্ম্মফল সান্ত। জ্ঞান কর্ম্মফলের ধ্বংস করিতে পারে। কর্ম্মফলের ধ্বংস হইলেই প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ নষ্ট হইবে। তাহা হইলেই মুক্তি। এক্ষণে এই প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ ধ্বংসকারী জ্ঞান কি? “নিজ স্বরূপ বোধ।” প্রকৃতিই সমস্ত ভোগের আধার ও বোধক, নিজে সমস্ত ভোগ হইতে পৃথক, এইরূপ জ্ঞান দ্বারা নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারিলে আর কর্ম্মফলে বাধ্য হইতে হয় না।

সাংখ্য দর্শনের মুল কথাঃ

সাংখ্য দর্শনে ২৫ টি তত্ত্বের উপদেশ আছে। কী কী সেই তত্ত্ব? প্রকৃতি, মহৎ, অহংকার, ১১ টি ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ইত্যাদি ৫ টি ইন্দ্রিয়, এছাড়া ৫ টি কর্মেন্দ্রিয় যেমন বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ; এছাড়া মন আরেকটি ইন্দ্রিয়), ৫ টি তন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) ও ৫টি মহাভুত (ক্ষিতি/পৃথিবী, অপ/জল, তেজ/অগ্নি, মরুৎ/বায়ু ও ব্যোম/আকাশ) এই হলো ২৪ টি তত্ত্ব আর বাকি ১ টা তত্ত্ব হচ্ছে “পুরুষ”। এই ২৫টি তত্ত্বের আবির্ভাব, পরস্পরের সন্মন্ধ এই সাংখ্য দর্শনের মুল প্রতিপাদ্য।

পুরুষ ছাড়া বাকি ২৪ তত্ত্বের মুল তত্ত্ব হচ্ছে “প্রকৃতি”। প্রকৃতির মধ্যেই জগতের সকল উপাদান। প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুনের সাম্যবস্থা। অর্থাৎ যখন এই তিনটি গুন কোন বিক্ষোভ সৃষ্টি না করে সমানভাবে অবস্থান করে তার নামই “প্রকৃতি”।

সত্ত্ব - স্থিরতা, সৌন্দর্য, ঔজ্জ্বল্য ও আনন্দ;
রজঃ - গতি, ক্রিয়াশীলতা, উচ্ছ্বাস ও যন্ত্রণা;
তমঃ - সমাপ্তি, কঠোরতা, ভার, ধ্বংস, ও আলস্য।

প্রকৃতি সাম্যবস্থায় নিষ্ক্রিয়, অচেতন ও জড়। পাশ্চাত্ত্য দর্শন মতে এটাই বস্তু জগত। প্রকৃতি পুরুষের সংস্পর্শে এসে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই পুরুষ হচ্ছে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের “ভাব” বা “চৈতন্য”। ভাবের সংস্পর্শে প্রকৃতির সাম্যবস্থা নষ্ট হয়, প্রকৃতি প্রান পায়। এই চৈতন্য বা ভাব বা পুরুষ যখন প্রকৃতিকে জানতে পারে তখন প্রকৃতি সংকুচিত হয়ে সরে যায় এবং চৈতন্য মুক্ত হয়। ভাবের দিক থেকে বস্তুকে দেখা বা পুরুষের দিক থেকে প্রকৃতিকে দেখা বা প্রকৃতির দিক থেকে পুরুষকে দেখার কারনেই সাধক যেই আশ্রয় ধারণ করে সেই আশ্রয়ের চোখে জগত কখনো পুরুষ হিসেবে আর কখনো প্রকৃতি হিসেবে দেখা দেয়। এটাই বস্তু ও ভাবের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক। এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে সাংখ্য দর্শন “লীলা” বলে। সাংখ্য দর্শন মতে বস্তুর লোপ নাই, নতুন বস্তুর আবির্ভাব নাই; আছে শুধু বস্তুর অবস্থান্তর প্রাপ্তি। এটাই বস্তুর অবিনাশী তত্ত্ব। ল্যাভয়সিয়ের বস্তর অবস্থান্তর তত্ত্ব, জোসেফ প্রুস্তের ডেফিনিট প্রপোরশন আর ডালটনের পরমানু তত্ত্ব এই বস্তুর অবিনাশী তত্ত্বের উপরে দাড়িয়ে আছে।

ভারতবর্ষে যোগীদের অতীত ও অনাগতকে প্রত্যক্ষ করেন বলে কথিত ছিল। এই সম্ভাবনা এই অবিনাশী তত্ত্বেই লুকিয়ে আছে। দুধে দইয়ের সম্ভাবনা আছে; আর যে অঙ্কুর বৃক্ষে পরিণত হয়েছে সেই অঙ্কুর একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। তাই বস্তুর পরিনাম বা অবস্থান্তর প্রাপ্তি যিনি জানেন তিনি অতীত ও অনাগতকে বর্তমানের মতো প্রত্যক্ষ করতে পারেন। কার্যে লীন কারণ ও কারণে অব্যক্ত কার্য দুটোকেই প্রত্যক্ষ করা সম্ভব।

সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বর নাই। কারণ জগত-প্রপঞ্চ ব্যাখ্যায় প্রকৃতি আর পুরুষই যথেষ্ট। তাই এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না, বেদের প্রামাণ্য মানলেও কেন বেদান্তবাদীদের আক্রমন সাংখ্য দর্শনকে সহ্য করতে হয়েছে। পুরুষ মুক্তি পায় সে যখন প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।

প্রকৃতি ও পুরুষের ধারনাঃ

প্রকৃতি ও পুরুষের ধারনাই পশ্চিমে বস্তু আর ভাব হিসেবে বিকশিত হয়েছে। ভাব ও বস্তুর ইউরপিয়ান দান্দিক সম্পর্ক ভারতবর্ষে "লীলা" বলে পরিচিত। এখানেই পশ্চিমের চিন্তার সাথে আমাদের মোকাবেলার শর্ত তৈরি হয়ে যায়। প্রকৃতি শব্দটা সংস্কৃত ব্যকরন অনুযায়ী স্ত্রীবাচক। প্রকৃতিকে তাই কোথাও লজ্জাশীলা বধু (কারিকা, ৬১) কোথাও নর্তকী (সুত্র ৩।৬৯) হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। সাংখ্য দর্শন হলেও নারি আর পুরুষের প্রেম, অপ্রেম আর লীলা কাব্যেও রূপ পেয়েছে। পুরুষ-প্রকৃতির সম্পর্ককে নর-নারীর সনাতন সম্পর্কের রূপক হিসেবেই দেখা হয়েছে। দর্শন থেকে কাব্যের এমন মনোহর উত্তরণ পশ্চিমে হয়নি। আমরা অবশ্য কাব্য ধরে দর্শন ভুলে গেছি। রাঁধা আর কৃষ্ণ বাঙলার ভাব চর্চায় সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি আর পুরুষের প্রতীক। রাঁধা আর কৃষ্ণের প্রেম হচ্ছে লীলা যা প্রতিকায়িত করেছে বস্তু আর ভাবের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে।

ভারতীয় ষড়দর্শনের অন্যতম সাংখ্যদর্শন বা **সাংখ্যশাস্ত্রকে প্রাচীনতম ভারতীয় দর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মহর্ষি কপিল হচ্ছেন এই দর্শনের সূত্রকার। তাই সাংখ্যকে কখনও কখনও কপিল–মত বা কপিল–দর্শন** নামেও উল্লেখ করা হয়ে থাকে। বলা হয়ে থাকে, কপিলের শিষ্য ছিলেন আসুরি এবং আসুরির শিষ্য ছিলেন পঞ্চশিখ। কথিত আছে যে, মুনি কপিল দুঃখে জর্জরিত মানুষের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাঁর শিষ্য আসুরিকে পবিত্র ও সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান সাংখ্যশাস্ত্র প্রদান করেছিলেন। আসুরি সেই জ্ঞান পঞ্চশিখকে প্রদান করেন। এরপর পঞ্চশিখ–এর দ্বারা সাংখ্যশাস্ত্র নানাভাবে বহু শিষ্যের মধ্যে প্রচার হয়েছিলো। পঞ্চশিখ–এর কাছ থেকে শিষ্যপরম্পরাক্রমে মুনি কপিল প্রণীত এই সাংখ্যশাস্ত্র ভালোভাবে জেনে ঈশ্বরকৃষ্ণ আর্য্যা ছন্দে 'সাংখ্যকারিকা' নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তা–ই এখন পর্যন্ত সাংখ্য সম্প্রদায়ের প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। সাংখ্যদর্শনের পরিচয় প্রসঙ্গে সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেন–

''এতৎ পবিত্রমগ্র্যাং মুনিরাসুরয়েহনুম্পয়া প্রদদৌ।আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তে চ বহুধা কৃতং তন্ত্রম্ ।। (সাংখ্যকারিকা–৭০)

***অর্থাৎ**: কপিল মুনি দয়াপরবশ হয়ে এই পবিত্র ও সর্বোৎকৃষ্ট (জ্ঞান) আসুরিকে প্রদান করেন, আসুরিও পঞ্চশিখকে (এই জ্ঞান দান করেন) এবং তার (অর্থাৎ পঞ্চশিখ) দ্বারা সাংখ্যশাস্ত্র বহুভাবে শিষ্য মধ্যে প্রচার হয়েছিলো। "*

'"তত্র পঞ্চশিখো নাম কাপিলেয়ো মহামুনিঃ।পরিধাবন্মহীং কৃৎস্নাং জগাম মিথিলামথ।। (শান্তিপর্ব: ২১৫/৬)

***অর্থাৎ** : সেই সময়ে কপিলানাম্নী কোন ব্রাহ্মণীর পুত্র মহর্ষি পঞ্চশিখ সমগ্র পৃথিবী পর্যটন করে পরে মিথিলানগরে এলেন।*

ঋষীণামাহুরেকং যং কামাদবসিতং নৃষু।শাশ্বতং সুখমত্যন্তমন্বিচ্ছন্তং সুদুর্ল্লভম্ ।। (শান্তিপর্ব: ২১৫/৮)

অর্থাৎ *: সেই যে পঞ্চশিখ ঋষিদের মধ্যে অদ্বিতীয় ও মনুষ্যমধ্যে সকল কামনা থেকে বিরত ছিলেন এবং নিত্য, অত্যন্ত ও অতিদুর্লভ নির্বাণমুক্তি কামনা করতেন, তা সেকালের লোকেরা বলতো।*

যমাহুঃ কপিলং সাংখ্যাঃ পরমর্ষিং প্রজাপতিম্ ।স মন্যে তেন রূপেণ বিস্মাপয়তি হি স্বয়ম্ ।। (শান্তিপর্ব: ২১৫/৯)

অর্থাৎ *: সাংখ্যমতাবলম্বীরা যাঁকে মহর্ষি ও প্রজাপতি কপিল বলেন; আমি মনে করি, স্বয়ং সেই কপিলই পঞ্চশিখরূপে এসে জ্ঞানালোকের প্রভাবে সকল লোককে বিস্ময়াপন্ন করছেন; তাও তখন কেউ কেউ বলতো।*

তমাসীনং সমাগম্য কাপিলং মণ্ডলং মহৎ।পুরুষাবস্থমব্যক্তং পরমার্থং ন্যবেদয়ৎ।। (শান্তিপর্ব: ২১৫/১১)

অর্থাৎ *: একদা আসুরি আপন তপোবনে উপবিষ্ট ছিলেন; এমন সময়ে সাংখ্যমতাবলম্বী বহুতর মুনি সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে পুরুষরূপ অব্যক্ত, পরম পদার্থ বলবার জন্য নিবেদন করলেন।*

যত্তদেকাক্ষরং ব্রহ্ম নানারূপং প্রদৃশ্যতে।আসুরির্মণ্ডলে তস্মিন্ প্রতিপেদে তদব্যয়ম্ ।। " (শান্তিপর্ব: ২১৫/১৩)

অর্থাৎ *: সেই যে একাক্ষরময় ব্রহ্ম নানাপ্রাণীতে নানারূপে দৃষ্ট হন, সেই অবিনশ্বর ব্রহ্মের বিষয় আসুরি সেই মুনিগণের নিকট বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করেছিলেন।.এতন্মে ভগবানাহ কাপিলেয়স্য সম্ভবম্ ।তস্য তৎ কাপিলেয়ত্বং সর্ববিত্বমনুত্তমম্ ।। (শান্তিপর্ব: ২১৫/১৬)*

অর্থাৎ *: ভগবান্ মার্কণ্ডেয় এই পঞ্চশিখের উৎপত্তি এবং তাঁর কাপিলেয়ত্ব ও সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বজ্ঞত্ব বিষয় আমাকে বলেছিলেন। "*

মহাভারতে সাংখ্যমতের বিস্তৃত আলোচনা থেকে এ দর্শনের প্রভাব ও প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায় অবশ্যই। অন্যদিকে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের প্রাচীন সূত্রগ্রন্থ **'চরক–সংহিতা'**র দার্শনিক অনুক্রমে এই সাংখ্যশাস্ত্রেরই ভিত্তি পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

'' সত্ত্বমাত্মা শরীরঞ্চ ত্রয়মেতাত্রিদণ্ডবৎ।লোকস্তিষ্ঠতি সংযোগাৎ তত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।।স পুমাং শ্চেতনং তচ্চ তচ্চাধিকরণং স্মৃতম্ ।বেদস্যাস্য তদর্থংহি বেদোহয়ং সম্প্রকাশিতঃ।। (চরক–সংহিতা: প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা–৬)

***অর্থাৎ** : মন, আত্মা ও শরীর– এরা ত্রিদণ্ডের ন্যায়। অর্থাৎ যেমন তিনটি দণ্ডের সংযোগে একটি ত্রিদণ্ড (ত্রিপদী বা তেপায়া) প্রস্তুত হয় এবং তার উপর দ্রব্যাদি রাখা যায়, তেমনি মন, আত্মা ও শরীরের সংযোগেই লোক সকল জীবিত রয়েছে এবং এই সংযোগের উপরই কর্মফল, বিষয়বাসনা সুখ, দুঃখ, জ্ঞানাজ্ঞান প্রভৃতি সবকিছু নির্ভর করছে। এদের সংযুক্ত অবস্থাকেই পুরুষ বলে। এই পুরুষই চেতন, তিনিই সুখ দুঃখাদির আধার এবং এরই জন্য এই আয়ুর্বেদ প্রকাশিত হয়েছে। "*

.

বৈদিক সংস্কৃতিতে সকল শাস্ত্রের সার বলে কথিত প্রাচীন মনুস্মৃতি বা মনুসংহিতায়ও সাংখ্যদর্শনের প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। মূলত মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের দার্শনিক প্রপঞ্চটাই সংখ্যদর্শন ভিত্তিক। যেমন–

বৈদিক সংস্কৃতিতে সকল শাস্ত্রের সার বলে কথিত প্রাচীন মনুস্মৃতি বা মনুসংহিতায়ও সাংখ্যদর্শনের প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। মূলত মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের দার্শনিক প্রপঞ্চটাই সংখ্যদর্শন ভিত্তিক। যেমন–

'তেষামিদন্তু সপ্তানাং পুরুষাণাং মহৌজসাম্ ।সূক্ষ্মাভ্যো মূর্তিমাত্রাভ্যঃ সম্ভবত্যব্যয়াদ্ব্যয়ম্ ।। (মনুসংহিতা : ১/১৯)

***অর্থাৎ** : মহত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব এবং পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটি অনন্তকার্যক্ষম শক্তিশালী পুরুষতুল্য পদার্থের সূক্ষ্ম মাত্রা থেকে এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে; অবিনাশী পুরুষ (পরমাত্মা) থেকে এইরকম অস্থির জগতের উৎপত্তি হয়েছে।*

আদ্যাদ্যস্য গুণং ত্বেষামবাপ্নোতি পরঃ পরঃ।যো যো যাবতিথশ্চৈষাং স স তাব গুণঃ স্মৃতঃ।। (মনুসংহিতা : ১/২০)

***অর্থাৎ** : আকাশাদি পঞ্চভূতের মধ্যে পর–পর প্রত্যেকে পূর্ব–পূর্বের গুণ গ্রহণ করে। এদের মধ্যে যে সৃষ্টিক্রমে যে স্থানীয়, সে ততগুলি গুণ পায়। –প্রথম ভূত আকাশের ১ গুণ,- শব্দ। দ্বিতীয় ভূত বায়ুর ২ গুণ,- শব্দ ও স্পর্শ। তৃতীয় ভূত অগ্নির ৩ গুণ– শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ। চতুর্থ ভূত জলের ৪ গুণ– শব্দ, স্পর্শ, রূপ এবং রস। পঞ্চম ভূত পৃথিবীর ৫ গুণ– শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ।*

অন্তত (আজ বাংলা ১৪৩০ সনের বৈশাখ মাস হইতে) ২৪০০ বছরের পূর্ব থেকেই বিখ্যাত প্রামাণিক গ্রন্থ কৌটিল্য প্রণীত 'অর্থশাস্ত্র'–এ সাংখ্যদর্শনের প্রশস্তি দেখা যায়। কৌটিল্য সাংখ্যশাস্ত্রকে অনুমোদিত বিদ্যাচতুষ্টয়ের অন্যতম আন্বীক্ষিকীর অন্তর্গত শাস্ত্র হিসেবে বর্ণনা করেছেন–

'সাংখ্যং যোগো লোকায়তং চেত্যান্বীক্ষিকী'। (অর্থশাস্ত্র: ১/২/২)।

***অর্থাৎ** : সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত– এই তিনটি শাস্ত্র উক্ত আন্বীক্ষিকী–বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত।*

কৌটিল্যের এই বিদ্যাচতুষ্টয় হলো–

'আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি বিদ্যাঃ'। (অর্থশাস্ত্র: ১/২/১)।

***অর্থাৎ** : আন্বীক্ষিকী (হেতুবিদ্যা বা তর্কবিদ্যা বা মোক্ষদায়ক আত্মতত্ত্ব), ত্রয়ী (ঋক্–যজুঃ–সামবেদাত্মক বেদ–বিদ্যাসমুদায়), বার্তা (কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য বিষয়ক বিদ্যা) এবং দণ্ডনীতি (অর্থাৎ রাজনীতি বা নীতিশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র)।*

কৌটিল্যের মতে আন্বীক্ষিকী সকল বিদ্যার প্রদীপস্বরূপ–

প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্বকর্মণাম্।

আশ্রয়ঃ সর্বধর্মাণাং শশ্বদান্বীক্ষিকী মতা।। (অর্থশাস্ত্র: ১/২/২)।

***অর্থাৎ** : আন্বীক্ষিকীবিদ্যা (অপর-) সকল বিদ্যার প্রদীপস্বরূপ (মার্গদর্শক), সকল কর্মের (অর্থাৎ কর্মসাধনের পক্ষে) উপায়তুল্য, সকল (লৌকিক ও বৈদিক-) ধর্মের আশ্রয়স্বরূপ বলে সর্বদা পরিগণিত হয়ে থাকে।*

এসব প্রাচীন সাহিত্যে সাংখ্যমতের বহুতর উল্লেখ থেকে অনুমান করাটা অসম্ভব নয় যে, অন্তত **(আজ বাংলা ১৪৩০ সনের বৈশাখ মাস হইতে) প্রায় ২৯০০ বছর পূর্ব থেকেই ভারতীয় দর্শন জগতে সাংখ্যদর্শনের জোরালো উপস্থিতি ছিলো।** এবং প্রাচীন পুঁথিপত্রে এ–দর্শনের প্রভাব এতো ব্যাপক ও বিশাল যে, সাংখ্যমতের পেছনে অতি সুদীর্ঘ যুগের ঐতিহ্য স্বীকার না করলে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না বলে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ভারতীয় দর্শন' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন। ফলে সাংখ্যদর্শনকে খুবই প্রাচীন বলে স্বীকার করা অমূলক হবে না। আধুনিক বিদ্বানদের কেউ কেউ সাংখ্যকে গৌতম বুদ্ধের চেয়ে অনেক প্রাচীন কালের দর্শন বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তাঁদের মতে সাংখ্য–সম্প্রদায়ের প্রবর্তক কপিলের নাম থেকেই বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলাবস্তুর নামকরণ হয়েছিলো।

সুপ্রাচীন কাল থেকে সাংখ্যদর্শনের এই যে সুবিস্তৃত প্রভাব, তা সত্ত্বেও আশ্চর্যের বিষয় হলো, এ দর্শনের মূল গ্রন্থ সংখ্যা যৎসামান্যই বলা যায়। মহর্ষি কপিলকে এ দর্শনের সূত্রকার বলা হলেও কপিল রচিত কোন সাংখ্যসূত্র গ্রন্থের খোঁজ পাওয়া যায় না। **'তত্ত্বসমাস'** নামের ক্ষুদ্র একটি সূত্র–সংগ্রহ গ্রন্থকে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ ম্যাক্সমুলার সাংখ্যমতের প্রাচীনতম গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এই **তত্ত্বসমাসই মহর্ষি কপিলকৃত মূল সাংখ্যসূত্র।** কিন্তু এই প্রস্তাব মানতে নারাজ 'কীথ', 'গার্বে' প্রমুখ আধুনিক বিদ্বানেরা। একে তো তত্ত্বসমাসের প্রাচীনত্ব অনিশ্চিত, তার উপর সাংখ্যমতের প্রাচীন রূপটি সনাক্ত করার জন্য এই সংক্ষিপ্ত সূত্র–সংগ্রহের মূল্যও নগন্য। বিদ্বানদের মতে কেবলমাত্র ২২টি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র সূত্রের এই সমষ্টিকে পূর্ণ গ্রন্থ না বলে গ্রন্থের বিষয়সূচিই বলা যায়।

এছাড়া কপিলের শিষ্য আসুরি এবং আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখের রচিত কোন গ্রন্থেরও সন্ধান পাওয়া যায় না। হতে পারে তাদের রচিত গ্রন্থ এখন বিলুপ্ত। এক্ষেত্রে (আজ বাংলা ১৪৩০সনের বৈশাখ মাস হইতে) প্রায় ৬০০ বছর আগে কোন এক সময়ে

সাংখ্য দার্শনিক বিজ্ঞানভিক্ষুর বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। সাংখ্যপ্রবচনসূত্রের ভাষ্যগ্রন্থ সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যের ভূমিকায় ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু স্বয়ং বলেছেন–

'কালার্কভক্ষিতং সাংখ্যশাস্ত্রং জ্ঞান–সুধাকরম্ ।

কলাবশিষ্টং ভূয়োহপি পুরয়িষ্যে বচোহমৃতৈঃ।। (সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য)

***অর্থাৎ** : সাংখ্যশাস্ত্র কালসূর্যেও গ্রাসে পতিত হয়েছে এবং তার কলামাত্রই অবশিষ্ট আছে; আমি অমৃতবাক্যের দ্বারা তা পূরণ করবো।*

তবে ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা'য় পঞ্চশিখ প্রণীত কপিলের উপদেশসমূহের এক বৃহৎ সংগ্রহ 'ষষ্ঠিতন্ত্র'–এর উল্লেখ পাওয়া যায়–

'সপ্তত্যাং কিল যেহর্থাস্তেহর্থাঃ কৃৎস্নস্য ষষ্টিতন্ত্রস্য।

আখ্যায়িকাবিরহিতাঃ পরবাদবিবর্জ্জিতাশ্চাপি।। (সাংখ্যকারিকা–৭২)

***অর্থাৎ** : (পঞ্চশিখ রচিত) সমগ্র ষষ্টিতন্ত্রে যে সমস্ত বিষয় (বা তত্ত্ব) বর্ণিত, আখ্যায়িকা ও পরমত খণ্ডন ছাড়া, সেই সমস্ত তত্ত্বই সত্তরটি কারিকায় বলা হয়েছে।*

মূলত ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত **'সাংখ্যকারিকা'**–ই বর্তমানে সাংখ্যশাস্ত্রের প্রাচীনতম নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। ষষ্ঠিতন্ত্র নামে যে বৃহৎ সংগ্রহ গ্রন্থ ছিলো, ঈশ্বরকৃষ্ণ সেই ষষ্ঠিতন্ত্রের কাহিনী ও প্রবাদসমূহ বর্জন করে দর্শনের আসল তত্ত্বকে সত্তরটি শ্লোকে গ্রথিত করেছেন। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে,-

'এতে বোঝা যায় যে ষষ্ঠীতন্ত্র ছিলো বৌদ্ধ পিটক ও জৈন আগমের মতো এক বৃহৎ সাম্প্রদায়িক পিটক, যার মধ্যে বুদ্ধ ও মহাবীরের মতো কপিলের এবং সম্ভবত তাঁর শিষ্য আসুরির উপদেশ ও তত্ত্ব সংগৃহীত হয়েছিলো।'

ধারণা করা হয়, (আজ বাংলা ১৪৩০সনের বৈশাখ মাস হইতে) প্রায় ২৬০০ বছর আগে কোন এক সময়ে ঈশ্বরকৃষ্ণ কর্তৃক 'সাংখ্যকারিকা' রচিত হয়েছে। সত্তরটি শ্লোকের সাহায্যে (মোট শ্লোকের সংখ্যা ৭২) এই গ্রন্থে সাংখ্যের সমুদয় তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ কারণে এই সাংখ্যকারিকা গ্রন্থটি 'সাংখ্যসপ্ততি' নামেও পরিচিত।

ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকার উপর পরবর্তীতে বহু টীকাগ্রন্থ রচিত হয়েছে। বর্তমানে প্রাপ্য গ্রন্থাদির মধ্যে **পরমার্থ** (আজ বাংলা ১৪৩০ সনের বৈশাখ মাস হইতে) ১৮০০ বছর আগে মতান্তরে বিন্ধ্যবাসী কর্তৃক চীনা ভাষায় রচিত 'সুবর্ণসপ্ততি' সর্বপ্রাচীন টীকাগ্রন্থ বলে গৃহীত হয়েছে। চীনে সুরক্ষিত ভারতীয় বৌদ্ধ পরম্পরা থেকে জানা যায় যে, সুবর্ণসপ্ততির সাংখ্যমত খণ্ডনের জন্য সমকালীন বৌদ্ধ দার্শনিক বসুবন্ধু 'পরমার্থসপ্ততি' নামে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সাংখ্যকারিকার উপর রচিত অন্যান্য ভাষ্য বা বৃত্তি ও টীকাগ্রন্থের মধ্যে নবম শতকে রচিত **বাচস্পতি মিশ্রের 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী'**, মাঠর রচিত 'মাঠরবৃত্তি, অজ্ঞাত

রচয়িতার ‘যুক্তিদীপিকা’ এবং গৌড়পাদ রচিত ‘গৌড়পাদভাষ্য’ প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
সাংখ্যদর্শনে ‘সাংখ্যপ্রবচনসূত্র’ নামে অপর একটি আকরগ্রন্থের নাম জানা যায়। এই গ্রন্থে সাংখ্যতত্ত্ব সমূহের তুলনামূলক বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। তার উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানভিক্ষু ষোড়শ শতাব্দিতে ‘সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য’ নামে একটি ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর মতে সাংখ্যপ্রবচনসূত্রই মহর্ষি কপিল কৃত প্রাচীন সাংখ্য দর্শন। কিন্তু পণ্ডিতদের কাছে এই অভিমত যুক্তিগ্রাহ্য (আজ বাংলা ১৪৩০ সনের বৈশাখ মাস হইতে) প্রায় ২৯০০ বছর পূর্ব থেকেই রচিত যে সকল সাংখ্য গ্রন্থ পাওয়া যায়, তার কোনটাতেই এই গ্রন্থের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। এমনকি মাধবাচার্যও তাঁর ‘সর্বদর্শনসংগ্রহে’ এ গ্রন্থের উল্লেখ করেন নি। এ থেকে অনুমিত হয় যে (আজ বাংলা ১৪৩০ সনের বৈশাখ মাস হইতে) প্রায় ২৬০০ বছর পূর্ব, এই গ্রন্থের রচনাকাল। অনিরুদ্ধ ভট্ট এই গ্রন্থের উপর ‘সাংখ্যসূত্রবৃত্তি’ নামে একটি টীকাগ্রন্থ রচনা করেন। বিজ্ঞানভিক্ষুর ‘সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য’ ছাড়াও ‘সাংখ্যসার’ নামে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ রয়েছে।
এছাড়া সীমানন্দ প্রণীত ‘সাংখ্যতত্ত্ববিবেচন’, ভাবাগনেশ প্রণীত ‘সাংখ্যতত্ত্ব যথার্থদীপন’ হরিহরানন্দের ‘সাংখ্যতত্ত্বালোক’ অনিরুদ্ধের ‘সাংখ্যপ্রদীপ’, পঞ্চানন তর্করত্নের ‘পূর্ণিমাটীকা’ প্রভৃতি সাংখ্য দর্শনের উপর ব্যাখ্যামূলক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বর্ণিত সকল গ্রন্থই যথারীতি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। তবে বাচস্পতি মিশ্রের কৃত ‘সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী’–ই ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকার উপর রচিত অতি বিস্তৃত, প্রাঞ্জল টীকাগ্রন্থ হিসেবে সর্বজনসমাদৃত।

সম্প্রদায়ের নামকরণ:
সাংখ্য সম্প্রদায়ের নামকরণের ব্যাপারে একাধিক মত প্রচলিত আছে। কারো কারো মতে ‘সাংখ্য’ শব্দটি এসেছে ‘সংখ্যা’ থেকে। এই সম্প্রদায় যেহেতু তত্ত্বের সংখ্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তাই এই সম্প্রদায়ের নাম ‘সাংখ্যসম্প্রদায়’। সাংখ্য মতে তত্ত্বের সংখ্যা পঞ্চবিংশতি বা পঁচিশ। এই পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের যথার্থ জ্ঞানের মাধ্যমে জীবের মুক্তি বা মোক্ষলাভ হয়। কিন্তু অন্যেরা এই মতকে যুক্তিগ্রাহ্য মনে করেন না। কেননা, প্রতিটি দর্শন সম্প্রদায়েই কতকগুলি নির্দিষ্ট তত্ত্ব স্বীকৃত এবং সেইগুলিকে সংখ্যার দ্বারা প্রকাশ করা যায়। যেমন, ন্যায়মতে ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান নিঃশ্রেয়সের হেতু। আবার বৈশেষিকমতে পদার্থের সংখ্যা সপ্ত বা সাত। এ কারণে কেউ কেউ মনে করেন, ‘সাংখ্য’ বলতে এখানে সম্যক–জ্ঞান (সাং+খ্য = সম্যক+জ্ঞান) বা যথার্থ জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে। সাংখ্যমতে জ্ঞান দ্বিবিধ– তত্ত্বজ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান এ দর্শনে ‘বিবেকজ্ঞান’ নামে পরিচিত। বিবেকজ্ঞানের মাধ্যমে জীবের দুঃখনিবৃত্তি হয়। যেহেতু এ দর্শনে বিবেকজ্ঞানকেই মোক্ষের হেতু বলা হয়েছে, তাই এ দর্শনকে সাংখ্যদর্শন বলা হয়।

এখানে উল্লেখ্য, ব্যাপক অর্থে 'সাংখ্য' শব্দের দ্বারা যোগ দর্শনকেও নির্দেশ করা হয়। মহর্ষি কপিল সাংখ্যসূত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি, তাই সাখ্য সম্প্রদায় ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন বলে এই দর্শনকে 'নিরীশ্বর সাংখ্য' বলা হয়। অন্যদিকে যোগদর্শনে যেহেতু ঈশ্বর স্বীকৃত, তাই যোগদর্শনকে 'সেশ্বর সাংখ্য' বলা হয়।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মতোই মূলত সাংখ্য ও যোগ দর্শন সমানতন্ত্র দর্শন। উভয় দর্শনে পার্থক্য সামান্যই। কপিলের সাংখ্য দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় তত্ত্বসমূহ, কিন্তু পতঞ্জলির যোগদর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় যোগ।

দুঃখ ও দুঃখনিবৃত্তি

দুঃখের অনুভূতি হলো মানবজীবনের সবচাইতে তীব্র ও কষ্টকর অনুভূতি। মূলত জীবন মানেই অসংখ্য দুঃখের সমষ্টি। এই দুঃখানুভূতির আবির্ভাবও ঘটেছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে। তাই চিরকালই প্রাণীমাত্রেই এই দুঃখকে জয় বা অতিক্রম করে সুখলাভের উপায় অনুসন্ধান করেছে। এবং এই অনুসন্ধিৎসা থেকেই ভারতীয় বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাধারারও উৎপত্তি হয়েছে। সাংখ্যশাস্ত্রও এর ব্যতিক্রম নয়। ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা'র প্রথম কারিকাটিই এই দুঃখ–কেন্দ্রিক

দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদপঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সাহপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোহভাবাৎ।। (সাংখ্যকারিকা–১)

অর্থাৎ : *ত্রিবিধ দুঃখের অভিঘাতের ফলে তার (অর্থাৎ সেই ত্রিবিধ দুঃখের) নিবৃত্তির (সাংখ্যশাস্ত্রীয়) উপায় বিষয়ে জিজ্ঞাসার উদয় হয়। লৌকিক উপায়ে দুঃখের অবশ্যম্ভাবী চিরনিবৃত্তি হয় না বলে (দুঃখ নিবৃত্তির) সেই (সাংখ্যশাস্ত্রীয়) উপায় বিষয়ে জিজ্ঞাসা ব্যর্থ হয় না।*

সহজ কথায় কারিকা-কারের মতে জন্ম থেকেই জীবকুল নানা ধরনের দুঃখতাপে দগ্ধ হয়। শুধু যে বিচিত্র দৈহিক জরা ও যন্ত্রণাই ভোগ করে তাই নয়। যুদ্ধ, মহামারী, ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগও তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। শুধু লৌকিক উপায়ে সমস্ত দুঃখের স্থায়ী নিবৃত্তি বা পরিত্রাণ সম্ভব হয় না বলে সাংখ্যশাস্ত্রে এই সব ধরনের দুঃখের আত্যন্তিক বা পূর্ণ বিনাশের উপায় বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, সাংখ্যকারিকায় দুঃখকে ত্রিবিধ অর্থাৎ তিন প্রকার বলা হলেও এর ব্যাখ্যা সাংখ্যকারিকায় পাওয়া যায় না। সাংখ্য শাস্ত্রকারদের মতে এই ত্রিবিধ দুঃখ বলতে এখানে দুঃখের সংখ্যা তিন– একথা বলা হয় নি। কারণ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে স্থিত অসংখ্য প্রাণীর অসংখ্য দুঃখ। এই তিন কালে স্থিত অসংখ্য প্রাণীর অসংখ্য দুঃখ ঈশ্বরকৃষ্ণের মতে তিন প্রকার– এটাই বক্তব্য। কিন্তু কারিকায় এই তিন প্রকার দুঃখও চিহ্নিত না থাকায় বাচস্পতি মিশ্র তাঁর 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী' গ্রন্থে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে–

‘দুঃখানাং ত্রয়ং দুঃখত্রয়ং।

তৎ খলু আধ্যাত্মিকং আধিভৌতিকং আধিদৈবিকং চঃ।’ সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী)

***অর্থাৎ** : দুঃখসমূহের ত্রয় দুঃখত্রয় বা ত্রিবিধ দুঃখ। এই ত্রিবিধ দুঃখ হলো আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক।*

সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে আন্তর উপায়ে অর্থাৎ শরীরের ভেতর থেকে উৎপন্ন রোগ জরাদি বা কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের অপ্রাপ্তি হেতু মানসিক দুঃখ–তাপসমূহ হলো আধ্যাত্মিক দুঃখ। এই আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার– শারীর ও মানস। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার তারতম্যের ফলে শারীর দুঃখ জন্মে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, ঈর্ষা, বিষাদ এবং কাঙ্ক্ষিত বিষয় না পাওয়ার ফলে মানস দুঃখ জন্মে।

অন্যদিকে আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ হলো বাহ্য উপায়ে সাধ্য অর্থাৎ শরীরের বাইরের কোন কারণ থেকে উৎপন্ন দুঃখ। মানুষ, পশু–পক্ষী, সরীসৃপ ও স্থাবর উৎস থেকে উৎপন্ন যে দুঃখ, তা হলো আধিভৌতিক দুঃখ। আর মহামারী, ভূমিকম্প, বিনায়ক প্রভৃতি দৈব বা গ্রহাদির সংস্থান থেকে উৎপন্ন যে দুঃখ, তাই আধিদৈবিক দুঃখ।

জন্ম থেকেই জীব এই দুঃখত্রয়ের ত্রিতাপ জ্বালায় জর্জরিত। এই ত্রিতাপ দুঃখ থেকে চিরনিবৃত্তিই তার চরম লক্ষ্য বা পরম পুরুষার্থ। প্রশ্ন হলো, এই দুঃখ নিবৃত্তির উপায় কী ?

দুঃখ নিবৃত্তির উপায়:

দুঃখের অভিভব বা নিবারণ সম্ভব এবং তিন প্রকার দুঃখের নিবারণের তিন প্রকার উপায় আছে। যথা– (১) দৃষ্টবৎ বা লৌকিক উপায়, (২) আনুশ্রবিক উপায় তথা বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি কর্মকলাপ এবং (৩) সাংখ্যশাস্ত্রবিহিত উপায়– তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেকজ্ঞান।

(১) দুঃখ নিবৃত্তির দৃষ্টবৎ বা লৌকিক উপায় :

দুঃখ নিবৃত্তির দৃষ্ট বা লৌকিক উপায় সর্বাপেক্ষা সহজসাধ্য। তিন প্রকার দুঃখের অভিভব বা নিবৃত্তির তিন প্রকার দৃষ্ট উপায় রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বাচস্পতি মিশ্র তাঁর ‘সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী’ গ্রন্থে বলেন–

‘সন্তি চোপায়াঃ শতশঃ শারীরদুঃখপ্রতীকারায়েষৎকরাঃ সুকরা ভিষজাং বরৈরুপদিষ্টাঃ।

মানসস্যাপি সন্তাপস্য প্রতীকারায় মনোজ্ঞস্ত্রী -পানভোজনবিলেপনঃ বস্ত্রালঙ্কারাদিবিষয়প্রাপ্তিরুপায়ঃ সুকরঃ।

এবমাধি -ভৌতিকস্য দুঃখস্যাপি নীতিশাস্ত্রাভ্যাস কুশলতানিরত্যয়স্থানাধ্যসনাদিঃ প্রতীকারহেতুরীষৎকরঃ।

তথাধিদৈবিকস্যাপি দুঃখস্য মণিমন্ত্রৌষধাদ্য উপযোগঃ সুকরঃ প্রতীকারোপায় ইতি।’– (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী)

অর্থাৎ:(আধ্যাত্মিক) শারীর দুঃখ নিবারণের জন্য শত শত সহজ উপায় আছে, যেমন বৈদ্যদের (অর্থাৎ আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞদের) দ্বারা উপদিষ্ট ভেষজাদি সেবন। (আধ্যাত্মিক) মানস দুঃখ নিবৃত্তির জন্য মনোজ্ঞ স্ত্রী (অথবা পুরুষ), পানীয়, সুস্বাদু খাদ্য সামগ্রী, প্রসাধন সামগ্রী, বস্ত্র, অলঙ্কার ইত্যাদি (অনেক) সহজলভ্য ভোগ্য বিষয় রয়েছে। এইরূপ আধিভৌতিক দুঃখ নিরাকরণের জন্য নীতিশাস্ত্রপাঠ, নিরাপদ স্থানে বাস ইত্যাদি বিবিধ সহজ উপায় আছে। অনুরূপভাবে আধিদৈবিক দুঃখ নিবৃত্তির জন্য সহজলভ্য মণি, মন্ত্র, ঔষধাদির ব্যবহাররূপ অনেক সহজ উপায় আছে।

দুঃখ নিবৃত্তির দৃষ্ট বা লৌকিক উপায় সর্বাপেক্ষা সহজসাধ্য হলেও দৃষ্ট উপায়ে দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি সম্ভব হয় না, অর্থাৎ সকল দুঃখের চিরনিবৃত্তি হয় না।

(২) দুঃখ নিবৃত্তির আনুশ্রবিক উপায় তথা বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি কর্মকলাপ

এটা মূলত মীমাংসকগণের দুঃখ নিবৃত্তির অনুসৃত উপায়। অনেক মুহূর্ত, প্রহর, দিন, রাত্রি, মাস এবং বৎসরাদি কাল যাবৎ অনুষ্ঠিতব্য বৈদিক জ্যোতিষ্টোমাদি কর্মকলাপ, তথা যাগযজ্ঞানুষ্ঠান দুঃখত্রয়কে নিবৃত্ত করতে সমর্থ। এর ফল স্বর্গলাভ। শ্র“তির ভাষ্য অনুযায়ী স্বর্গকামী ব্যক্তি যজ্ঞ করবেন। যে সুখ দুঃখের সঙ্গে মিশ্রিত নয়, যে সুখ পরে দুঃখের দ্বারা অভিভূত হয় না এবং যে সুখ ইচ্ছামাত্র উপস্থিত হয়, সেই সুখকে স্বর্গ বলে।

এই আনুশ্রবিক উপায়ের বিরোধিতা করে সাংখ্যাচার্য তথা বাচস্পতি মিশ্র বলেন–

‘আনুশ্রবিকোহপি কর্ম্মকলাপো দৃষ্টেন তূল্যো বর্ত্ততে ইতি। ঐকান্তিকাত্যন্তিকদুঃখত্রয়ঃ প্রতীকারানুপায়ত্বস্যোভয়ত্রাপি তুল্যত্বাৎ।’– (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী)

***অর্থাৎ** : আনুশ্রবিক (তথা বেদবিহিত) যাগযজ্ঞাদি কর্মকলাপ দৃষ্ট উপায়ের মতোই হয়ে থাকে। একান্ত ও অত্যন্তভাবে দুঃখের নিবৃত্তি করতে পারে না বলে দৃষ্ট ও আনুশ্রবিক উভয়েই সমান।*

আনুশ্রবিক উপায়ে কেন দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না, তার কারণ হিসেবে সাংখ্যাচার্যরা বলেন আনুশ্রবিক উপায় অবিশুদ্ধ, ক্ষয় ও অতিশয়যুক্ত। এটা অবিশুদ্ধ কেননা সোমাদি যাগে পশু–বীজাদি বধ করা হয়। এক্ষেত্রে ‘কোন জীবকে হিংসা করবে না’– এই সামান্য বা সাধারণ শাস্ত্রবাক্য ‘অগ্নিসোম যজ্ঞে বলি দেবে’– এই বিশেষ শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা বাধিত হয়। যদিও এই হিংসা (সাধারণভাবে) পুরুষের পাপ জন্মালেও যজ্ঞের উপকার করে।

অন্যদিকে পঞ্চশিখাচার্য–এর মতে– ‘যাগাদিক্রিয়া স্বল্পসঙ্কর, সপরিহার ও সপ্রত্যবমর্ষ’।

জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ থেকে উৎপন্ন প্রধান অপূর্বের সঙ্গে যজ্ঞে কৃত পশুহিংসা–জাত দুঃখের হেতু–রূপ অল্প পরিমাণ পাপের যোগ থাকে বলে তাকে স্বল্পসংকর বলে। এই যজ্ঞে কৃত পশুহিংসা–জাত পাপ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা কিছু পরিমাণে দূর করা যায় বলে তা সপরিহার।

আবার ভুল করে যদি যজ্ঞে কৃত পশুহিংসা জনিত পাপ নাশের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা না হয় তাহলে যজ্ঞের প্রধান কর্মফল স্বর্গ ভোগের সময় যজ্ঞে–কৃত পশুহিংসা জনিত পাপের ফল দুঃখ ভোগ হয়। তবু সেই পাপ থেকে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাকে সহজেই সহ্য করা যায়। সহিষ্ণুতার সঙ্গে বর্তমান বলে আনুশ্রবিক উপায়ে সাধ্য সুখকে সপ্রত্যবমর্ষ বলে।

এছাড়া যজ্ঞের ফল স্বর্গাদির ক্ষয় আছে– এটা লক্ষণার দ্বারা বোঝায়। যেহেতু স্বর্গ জন্য–পদার্থ অর্থাৎ যজ্ঞাদির ফলে স্বর্গ উৎপন্ন হয় বলে ভাবরূপ কার্য করে, সেহেতু অনুমিত হয় যে স্বর্গের ক্ষয় আছে।

আবার যজ্ঞের ফল স্বর্গাদির অতিশয় আছে– এটাও লক্ষণার দ্বারা বোঝায়। যেহেতু জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ কেবল স্বর্গ লাভের উপায়, কিন্তু বাজপেয়াদি যাগ স্বর্গের আধিপত্য লাভের উপায়– তাই এদের মধ্যে অতিশয় আছে। কেননা পরের অধিক সম্পদ দেখে স্বল্প সম্পদের অধিকারী পুরুষ যেমন দুঃখ পায়, তেমনি স্বর্গাধিপতির অধিক সম্পদ দেখে সাধারণ স্বর্গবাসীরাও দুঃখ পায়, তা যুক্তিযুক্ত।

আনুশ্রবিক উপায় দৃষ্ট উপায়ের মতো সহজসাধ্য না হলেও বহু জন্ম যাবৎ অনুষ্ঠিতব্য কষ্টসাধ্য তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেকজ্ঞান থেকে সহজসাধ্য। সাংখ্যাচার্যদের মতে, শুধু কর্মের দ্বারা দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ সম্ভব নয়। যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ড দ্বারা সাময়িকভাবে স্বর্গাদিসুখলাভ হতে পারে, কিন্তু তার দ্বারা দুঃখের আত্যন্তিক নির্বত্তি হতে পারে না। সাংখ্যমতে স্বর্গাদিসুখভোগ জীবের পুনর্বন্ধন সূচিত করে, আত্যন্তিক নিবৃত্তি সূচিত করে না।

(৩) সাংখ্য শাস্ত্রবিহিত উপায়– তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেকজ্ঞান:

সাংখ্যমতে লৌকিক বা বৈদিক কোন প্রকার কর্মের দ্বারাই জীবের মুক্তিলাভ হতে পারে না। জ্ঞানের দ্বারাই জীব দুঃখ থেকে চিরনিবৃত্তি লাভ করতে পারে। ব্যক্ত জগৎ, অব্যক্ত প্রকৃতি এবং জ্ঞ বা পুরুষের স্বরূপ অনুধাবনের মাধ্যমেই দুঃখের হাত থেকে জীবের চিরনির্বত্তি লাভ হতে পারে। ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ–এর এই ভেদজ্ঞানই সাংখ্য দর্শনে তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেকজ্ঞান বলে বিবেচিত হয়। এ বিষয়ে ঈশ্বরকৃষ্ণ 'সাংখ্যকারিকা'র দ্বিতীয় কারিকায় বলেন–

'দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।

তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ।।'– (সাংখ্যকারিকা–২)

***অর্থাৎ** : বৈদিক যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপও লৌকিক উপায়েল মতো ত্রিবিধ দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি সাধনে অসমর্থ। সেই যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ যেহেতু অবিশুদ্ধি, ক্ষয় ও অতিশয়যুক্ত, সেহেতু যাগযজ্ঞাদি*

ক্রিয়াকলাপের বিপরীত দুঃখ নিবৃত্তির সেই সাংখ্যশাস্ত্রীয় উপায় ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞান–ই শ্রেয়। কারণ ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ–এর বিবেকজ্ঞান থেকে দুঃখের অবশ্যম্ভাবী ও চির নিবৃত্তি হয়।

ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ– এই ত্রিবিধ তত্ত্বের বিভেদ জ্ঞান হলে দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি সম্ভব হয়। দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি হলো দুঃখের অবশ্য নিবৃত্তি এবং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হলো নিবৃত্ত দুঃখের পুনরায় উৎপত্তি না হওয়া। তবে তত্ত্বজ্ঞান অর্জন অনেক জন্মব্যাপী অভ্যাসপরম্পরা–রূপ আয়াসসাধ্য হওয়ায় তা অতি দুষ্কর।

কার্য-কারণ তত্ত্ব

কার্যের সঙ্গে কারণের সম্বন্ধ অর্থাৎ কার্যকারণতত্ত্ব দর্শনশাস্ত্রের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয়। আমরা কার্য প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু সেই কার্যের কারণ কী এবং সেই কারণের সঙ্গে ঐ কার্যের সম্বন্ধ কী ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করতে পারি না। তা জানার জন্য মানুষ যা ভেবেছে, সেই ভাবনার সমষ্টিই দর্শন। কার্যকারণভাবকে অবলম্বন করে জগতের মূলতত্ত্বে উপনীত হওয়াই দর্শনের লক্ষ্য। ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলি দৃশ্যমান বস্তুর কার্য–কারণভাবের দ্বারাই তাদের স্বরূপ অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন। প্রতিটি সম্প্রদায়ই স্বীকৃত তত্ত্ব ও স্বীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাগতিক কার্যকারণভাবকে ব্যাখ্যা করেছেন। ফলে স্বভাবতই ভারতীয় দর্শনসমূহে নানা ধরনের কার্য–কারণভাব পরিলক্ষিত হয়।

উৎপত্তিঘটিত কার্যকারণ বিষয়ে ভারতীয় দর্শনে অনেকগুলি মত প্রচলিত আছে। বেদান্ত ও সাংখ্যসম্প্রদায়–স্বীকৃত কার্য–কারণভাব **'সৎকার্যবাদ'** নামে পরিচিত। সাংখ্যসম্মত সৎকার্যবাদকে 'পরিণামবাদ' এবং অদ্বৈতবেদান্তসম্মত সৎকার্যবাদকে 'বিবর্তবাদ' বলা হয়। অন্যদিকে ন্যায়–বৈশেষিক ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়–স্বীকৃত কার্য–কারণভাব 'অসৎকার্যবাদ' বা 'আরম্ভবাদ' নামে পরিচিত। তবে সম্প্রদায়ভেদে তারও প্রকারভেদ রয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য কার্য–কারণবাদগুলির মধ্যে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য–

(১) সাংখ্যদর্শনের সৎকার্যবাদ বা পরিণামবাদ
(২) নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকদের পরমাণুবাদ বা আরম্ভবাদ
(৩) বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের বিবর্তবাদ
(৪) বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সংঘাতবাদ বা পরমাণুপুঞ্জবাদ
(৫) কাশ্মীরীয় পণ্ডিতদের আভাসবাদ।

সাধারণত যে কোন উৎপন্ন বস্তুকে বলা হয় কার্য এবং যা থেকে ঐ কার্য উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় ঐ কার্যের কারণ। বস্তুর কার্য–কারণভাব আপেক্ষিক। জগতের প্রায় সকল বস্তুই দেশ, কাল ও নিমিত্তভেদে কখনো কারণ, আবার কখনো কার্য হয়ে

থাকে, একান্ত কারণ বা একান্ত কার্য হয় না। আবার কারণ থেকে যে সকল কার্য উৎপন্ন হয় তারাও সকলে একরূপ নয়, ফলে কারণও নানাবিধ। সাংখ্য সম্প্রদায় উপাদান ও নিমিত্তভেদে দুই প্রকার কারণ স্বীকার করেন।

কার্যের যা উপাদান অর্থাৎ যা থেকে কার্য উৎপন্ন হয়, তাই তার উপাদান কারণ। উপাদানই কার্যের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়। ন্যায়মতে কার্যের উপাদান যেহেতু কার্যের সঙ্গে সমবায় সম্বন্ধে সংবদ্ধ হয়ে তার আশ্রয় হয়, সেহেতু কার্যের উপাদান কার্যের সমবায়ী কারণ। অপরদিকে যে ক্রিয়াশক্তির দ্বারা উপাদান থেকে কার্য উৎপন্ন হয়, সেই ক্রিয়াশক্তি হলো কার্যের নিমিত্ত কারণ। উপাদান আপনা–আপনি কার্যে পরিণত হয় না, এর জন্য প্রয়োজন উপাদানে ক্রিয়াশক্তির প্রয়োগ। এই ক্রিয়াশক্তি কার্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে না, কার্যের বাইরে থেকে কার্যকে ঘটায় মাত্র। একটি মৃত্তিকা–নির্মিত ঘটের ক্ষেত্রে মৃত্তিকা হলো উপাদান কারণ এবং দণ্ডচক্রাদি হলো তার নিমিত্ত কারণ।

কারণ ও কার্য যে ভিন্ন এবং উভয়ই যে সৎ, সে বিষয়ে ন্যায় ও সাংখ্য সম্প্রদায় একমত। কিন্তু প্রশ্ন হলো, উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণে বর্তমান থাকে কি না? এই প্রশ্নের যাঁরা সদর্থক উত্তরে বিশ্বাসী, তাঁদের বলা হয় **সৎকার্যবাদী**। অপরদিকে যাঁরা এই প্রশ্নের নঞর্থক উত্তরে বিশ্বাসী, তাঁদের বলা হয় **অসৎকার্যবাদী**।

সৎকার্যবাদী সাংখ্য সম্প্রদায় মনে করেন, কার্য আবির্ভূত হবার পূর্বে অব্যক্তাবস্থায় কারণে বর্তমান থাকে। অন্যদিকে অসৎকার্যবাদী ন্যায়–বৈশেষিক ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় মনে করেন, উৎপন্ন হবার পূর্বে কার্যের কোন অস্তিত্বই থাকে না, কার্য সম্পূর্ণভাবে নতুন সৃষ্টি বা আরম্ভ। ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধমতে, বস্তু উৎপত্তির পরমুহূর্তেই যেহেতু বিনষ্ট হয়, সেহেতু অসৎ কারণ থেকে সৎকার্যের উৎপত্তি হয়। আবার সৎকার্যবাদী অদ্বৈতবেদান্তমতে কার্য উৎপত্তির পূর্বে কারণে বর্তমান থাকলেও কারণ ও কার্য সমসত্তাক নয়। কারণের সত্তা কার্যের সত্তার অপেক্ষা অধিক এবং কার্যের সত্তা কারণের সত্তার অপেক্ষা ন্যূন। অদ্বৈতবেদান্তীদের এই কার্য–কারণতত্ত্ব বিবর্তবাদ নামে পরিচিত।

সাংখ্যমতে কারণ ও কার্য উভয়ই সৎ। কার্য উৎপত্তির পূর্বে শুধু যে কারণের মধ্যে বর্তমান থাকে তাই নয়, কারণ ও কার্য সমসত্তাক বা সমপ্রকৃতিক। কার্যের মধ্যে কারণের যথার্থ ও বাস্তব পরিণাম ঘটে থাকে। অর্থাৎ সৃষ্টিকালে সৎ কারণ সৎ কার্যে পরিণাম প্রাপ্ত হয় এবং প্রলয়কালে সৎ কার্য সৎ কারণে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। তাই সাংখ্য দর্শনের সৎকার্যবাদ পরিণামবাদ নামে পরিচিত।

সাংখ্যদর্শনে সৎকার্যবাদ

যে মতবাদ অনুসারে উৎপত্তির পরের মতো উৎপত্তির পূর্বেও কার্য তার উপাদান কারণে সৎ, তাকে বলে সৎকার্যবাদ। আর যে মতবাদ অনুসারে উৎপত্তির পূর্বে কার্য তার উপাদান কারণে অসৎ, তাকে বলে অসৎকার্যবাদ। সাংখ্য সম্প্রদায় সৎকার্যবাদী। সাংখ্য দার্শনিকদের সিদ্ধান্ত হলো–

'সতঃ সজ্জায়ত'। অর্থাৎ, সৎ বস্তু থেকে সৎ বস্তু উৎপন্ন হয়

সাংখ্যমতে কারণ কার্যেরই অব্যক্ত অবস্থা। অর্থাৎ, উৎপত্তির পূর্বে কার্য, কারণের মধ্যে অব্যক্তভাবে বা সূক্ষ্মভাবে থাকে বলে তাকে কেউ দেখতে পায় না। তাছাড়া কারণে কার্য কখনও অসৎ নয়। কার্য কারণেরই পরিণাম। কার্য নতুন আরম্ভ বা নতুন সৃষ্টি নয়। দুধ থেকে যখন দই উৎপন্ন হয়, তখন দুধ দইরূপে পরিণত হয়, দই নতুন সৃষ্টি নয়। দই উৎপন্ন হওয়ার আগে দুধের মধ্যে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, পরে সেটি দইরূপে অভিব্যক্ত হয়। সাংখ্য দার্শনিকদের মতে, পরিদৃশ্যমান শব্দ প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ সুখ দুঃখ মোহস্বভাব। তাঁদের মতে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিও সুখদুঃখমোহস্বভাব। সুতরাং কার্য ও কারণ সমসত্তাক বা সমপ্রকৃতিক। এটি স্বীকৃত হলে কার্যের প্রতি প্রকৃতির কারণতা যুক্তিসিদ্ধ হয়।

কার্য যে উৎপত্তির পূর্বে কারণে বর্তমান থাকে, কার্য যে কারণের বাস্তব পরিণাম এবং কারণ ও কার্য যে সমসত্তাক– সৎকার্যবাদী এই সিদ্ধান্তের পক্ষে সাংখ্যাচার্যগণ প্রধানত পাঁচটি যুক্তির অবতারণা করেছেন। সাংখ্যকারিকা-কার ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর সাংখ্যকারিকার নবম কারিকায় এই পাঁচটি যুক্তি উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন–

'অসৎ অকরণাৎ উপাদানগ্রহণাৎ সর্বসম্ভবাভাবাৎ।

শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাৎ চ সৎ কার্যম্' ।। (সাংখ্যকারিকা–৯)

***অর্থাৎ** : যা নেই তাকে উৎপন্ন করা যায় না, কার্য উৎপাদনে সমর্থ বস্তু থেকেই উৎপাদনযোগ্য বস্তু উৎপন্ন হতে পারে, যে কোন কিছু থেকে যে কোন কিছু উৎপন্ন হয় না, একটি বস্তু যে কার্য উৎপাদনে সমর্থ সেই বস্তুটি কেবলমাত্র সেই কার্যই উৎপাদন করে এবং কার্য স্বরূপত কারণ থেকে অভিন্ন বলে একটি কার্য উৎপত্তির পূর্বে তার উপাদান কারণে অস্তিত্বশীল থাকে।*

মোটকথা, এই কারিকায় কার্যমাত্রে সত্ত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে যে পাঁচটি হেতু প্রদর্শন করা হয়েছে, তা হলো–

(১) **অসৎ–অকরণাৎ**, অসৎ বস্তুর অনুৎপত্তিহেতু, অর্থাৎ যা নেই বা অসৎ তা উৎপন্ন হয় না,

(২) **উপাদান–গ্রহণাৎ**, কার্যমাত্রই উপাদানজন্য হেতু, অর্থাৎ কারণের সঙ্গে কার্যের সম্বন্ধ স্বীকার্য,

(৩) **সর্বসম্ভবাভাবাৎ**, যে কোন বস্তু থেকে যে কোন বস্তুর অনুৎপত্তি হেতু, অর্থাৎ বিশেষ কারণ থেকে বিশেষ কার্যই উৎপন্ন হয়,

(৪) **শক্তস্য–শক্যকরণাৎ**, শক্য কারণ থেকে কার্যের উৎপত্তিহেতু, অর্থাৎ শক্য কারণের মধ্যেই কার্যশক্তি নিহিত থাকে , এবং

(৫) **কারণভাবাৎ**, কার্য–কারণ–ভাব, অর্থাৎ উপাদান কারণ ও কার্য অভিন্ন।

সৎকার্যবাদের সমর্থনে এবং বিভিন্ন পূর্বপক্ষ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে সাংখ্য দার্শনিকদের পক্ষ থেকে এই হেতুগুলি প্রদর্শন করা হয়েছে। যেসব প্রেক্ষিতে এসব যুক্তির উত্থাপন হয়েছে তা দেখা যেতে পারে।

প্রথমহেতু: (অসদকরণাৎ)– সৎকার্যবাদের পক্ষে সাংখ্য সম্প্রদায়ের প্রথম যুক্তি হলো, কার্য যদি উৎপত্তির পূর্বে অসৎ হয়, তাহলে কার্যের উৎপত্তি আদৌ সম্ভব হয় না। যা অসৎ তাকে কোনভাবেই উৎপন্ন করা যায় না, যেমন– গগনকুসুম। সহস্র শিল্পীও গগনকুসুমকে সৃষ্টি করতে বা নীলবর্ণকে পীতবর্ণ করতে পারে না।

এরূপ যুক্তির উত্তরে অসৎকার্যবাদীরা বলতে পারেন না, যা সর্বকালেই অসৎ তাকে কেউ উৎপন্ন করতে পারে না– একথা ঠিক। কিন্তু উৎপত্তির পূর্বে কার্য গগনকুসুমাদির ন্যায় সর্বকালে থাকে না। কার্য উৎপত্তির পূর্বে অসৎ, কিন্তু উৎপত্তির পরে সৎ হয়। সত্তা ও অসত্তা উভয়ই কার্যের ধর্ম। তার মধ্যে উৎপত্তির পূর্বকালে কার্যে অসত্তাধর্ম থাকে, আর উৎপত্তিকাল থেকে স্থিতিকাল পর্যন্ত কার্যে সত্তাধর্ম থাকে।

এরূপ আপত্তির উত্তরে সাংখ্য সম্প্রদায়ের বক্তব্য হলো, উৎপত্তির পূর্বে কার্যে অসত্তাধর্ম থাকতেই পারে না। কেননা, কার্য যদি উৎপত্তির পূর্বে অসৎ হয়, তাহলে অসত্তাধর্ম উৎপত্তি–পূর্বকালীন কার্যে বর্তমান থাকে, একথা বলতে হয়। কিন্তু একথাও বলা যায় না। অসৎধর্মীতে কোন ধর্ম থাকা সম্ভব নয়। আর উৎপত্তির পূর্বে কার্য যদি সৎ হয়, তাহলে তাতে অসত্তাধর্ম থাকার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং অসত্তা কোনভাবেই কার্যবস্তুর ধর্ম হতে পারে না।

সৎকার্যবাদের বিপক্ষে অসৎকার্যবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকরা বলেন যে, অসৎ কারণ থেকে সৎ কার্যের উৎপত্তি হয়। উক্ত বক্তব্যের সমর্থনে দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁরা বলেন যে, বীজের বিনাশ থেকে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় অথবা মৃৎপিণ্ড বিনষ্ট হলে তবে ঘট উৎপন্ন হয়।

উক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে সাংখ্য দার্শনিকদের বক্তব্য হলো, বিনাশের কোন কার্যোৎপাদন ক্ষমতা থাকতে পারে না। বীজ, মৃৎপিণ্ড ইত্যাদি ভাববস্তুরই কার্যোৎপাদন সামর্থ্য আছে। কিন্তু বিনাশ অভাব, অবস্তু। বিনাশ থেকে যদি বস্তু উৎপন্ন হতো, তাহলে অসংখ্য বিনাশ বা অভাব জগতের সর্বত্র থাকায় জগতে সর্বত্রই সব কার্য উৎপন্ন হতে পারতো। কিন্তু তা হয় না। সুতরাং, অসৎ থেকে সৎ উৎপন্ন হয়, এই মত গ্রাহ্য নয়।

অন্যদিকে বৈদান্তিকরা যে জগৎকার্যকে মায়িক বলেন, সাংখ্য দার্শনিকরা তা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন যে, জগৎ যে সৎ বস্তু নয়– একথা স্বীকারের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি নেই। অতএব সৎ কারণ থেকে অনির্বচনীয় কার্য উৎপন্ন হয়, এই মতও গ্রাহ্য নয়।

সৎকার্যবাদের অন্যতম প্রতিপক্ষ হলো ন্যায়–বৈশেষিক সম্প্রদায়। এই মতে উৎপত্তির পূর্বে কারণে কার্যের প্রাগভাব থাকে। কার্য যদি কারণে আগে থেকেই থাকে, তাহলে কার্য উৎপন্ন হলো, একথা বলা নিরর্থক হয়ে যায়। 'অবয়বী' একটি নতুন আরম্ভ, এটি অবয়বের অতিরিক্ত। তাছাড়া ঘট, পট, ইত্যাদি যদি মাটি, সুতো ইত্যাদিতে আগে থেকেই থাকে তাহলে কুম্ভকার, তন্তুবায় ইত্যাদির প্রযত্ন নিরর্থক হয়ে যায়।

উক্ত পূর্বপক্ষ খণ্ডন প্রসঙ্গে 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী' গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্র বলেন–

'অসৎ চেৎ কারণব্যাপারাৎ পূর্ব্বং কার্য্যম্, নাস্য সত্ত্বং কর্ত্তুং কেনাপি শক্যম্। ন হি নীলং শিল্পিসহস্রেণাপি শক্যং পীতং কর্ত্তুম শক্যতে।'– (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী)

***অর্থাৎ**: যদি কারণ–ব্যাপারের পূর্বে কার্য (উপাদান কারণে) অসৎ হয়, তবে কেউ তাকে উৎপন্ন করতে পারে না। সহস্র শিল্পীও নীলকে পীত (বা হলুদ) করতে পারে না।*

সুতরাং, কারণে কার্য উৎপত্তির আগে থেকেই অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। কুম্ভকার, তন্তুবায় প্রভৃতি সেই অব্যক্ত কার্যকে ব্যক্ত করেন মাত্র। আমাদের অভিজ্ঞতায় এরকম অব্যক্তের ব্যক্ত হওয়ার একাধিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে বাচস্পতি মিশ্র তাঁর তত্ত্বকৌমুদী গ্রন্থে আরো বলেন–

'কারণাচ্চাস্য সতোহভিব্যক্তিরেবাশিষ্যতে সতশ্চাভিব্যক্তিরুপপন্না, যথা– পীড়নেন তিলেষু তৈলস্য, অবঘাতেন ধান্যেষু তণ্ডুলানাং, দোহনেন সৌরভেয়ীষু পয়সঃ। অসতঃ করণে তু ন নিদর্শনং কিঞ্চিদস্তি। ন খল্বভিব্যজমানং চোৎপদ্যমানং বা ক্বচিদসদ্ দৃষ্টম্ ।'– (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী)

***অর্থাৎ**: কারণ–ব্যাপারের ফলে এই সৎ কার্যেরই অভিব্যক্তি উৎপন্ন হয়। যেমন, পীড়ন বা পেষণের দ্বারা তিল থেকে তেল উৎপন্ন হয়, আঘাতের দ্বারা ধান থেকে চাল উৎপন্ন হয়, দোহনের দ্বারা গাভী থেকে দুধ পাওয়া যায়। কিন্তু অসদ্বস্তু উৎপন্ন হচ্ছে, এমন কোথাও দেখা যায় না।*

তাঁর মতে, কেউ বলবে না যে ঐ তেল, চাল বা দুধ আগে থেকে তিলে, ধানে বা গাভীতে ছিলো না। কারণ তা যদি না থাকতো, তাহলে তেল, চাল, দুধ আমরা ঐভাবে পেতাম না। সুতরাং যা অসৎ তা কখনো উৎপন্ন হয় না।

এ প্রেক্ষিতে পূর্বপক্ষী বলতে পারেন যে কার্য উৎপত্তির পূর্বে অসৎই। যেখানে ঘটসংযোগ ছিলো সেখান থেকে ঘটকে অপসারিত করার পর সেখানে যেমন ঘটাভাব থাকে, অনুরূপভাবে ঘট উৎপত্তির পূর্বেও কপালে ঘটাভাব থাকে। যেখানে ঘটাভাব থাকে, সেখানে ঘট থাকতে পারে না। সুতরাং, উৎপত্তির পূর্বে কপালে ঘট থাকতে পারে না। উক্ত বক্তব্যের প্রতিবাদে স্বমতস্থাপনের উদ্দেশ্যে সাংখ্যকারিকায় দ্বিতীয় হেতুটি উপস্থাপন করা হয়।

দ্বিতীয়হেতু: (উপাদানগ্রহণাৎ) – সৎকার্যবাদ সমর্থনে সাংখ্য সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় যুক্তি হলো, কারণের সঙ্গে কার্যের সম্বন্ধ অবশ্যস্বীকার্য। উপাদান অর্থ কারণ, গ্রহণ অর্থ সম্বন্ধ। কারণের সঙ্গে কার্যের সম্বন্ধ থাকার জন্য কার্যকে উৎপত্তির পূর্বে সৎ বলতে হবে। যে কারণ যে কার্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, সেই কারণই সেই কার্যের জনক হতে পারে। অন্যথা মৃত্তিকা হতে পট বা বস্ত্রের উৎপত্তি এবং তন্তু হতে ঘটের উৎপত্তি হয় না কেন ? উৎপত্তির পূর্ব থেকে কার্যের সঙ্গে কারণের সম্বন্ধ স্বীকার করলে আর ঐ আপত্তি ওঠে না। কপাল প্রভৃতির সঙ্গে ঘট প্রভৃতির কার্যকারণ সম্বন্ধ

অনস্বীকার্য। সম্বন্ধ সর্বদা উভয়বৃত্তি। কার্যটি উৎপত্তির পূর্বে অসৎ হলে কিন্তু ঐ সম্বন্ধ সম্ভব হয় না। আবার উক্ত কার্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকার না করলে নির্দিষ্ট কারণ থেকে নির্দিষ্ট কার্যের উৎপত্তি উপপন্ন হবে না।

বস্তুতপক্ষে যে কারণের সঙ্গে যে কার্যের সম্বন্ধ আছে সেই কারণ থেকেই সেই কার্য উৎপন্ন হতে পারে। ঘটের সঙ্গে মৃত্তিকার সম্বন্ধ আছে, কিন্তু বস্ত্রের সঙ্গে নেই। তাই মৃত্তিকা থেকে ঘটেরই উৎপত্তি হয়, বস্ত্রের হয় না। কারণের সঙ্গে কার্যের সম্বন্ধ যেহেতু অবশ্যস্বীকার্য, সেহেতু উৎপত্তির পূর্বেও কার্যের সত্তা স্বীকার করতে হয়। উৎপত্তির পূর্বে ঘট অসৎ হলে তার সঙ্গে সৎ মৃত্তিকার সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে না, কারণ সৎ ও অসতের মধ্যে কোন সম্বন্ধ সম্ভব নয়। অতএব উৎপত্তির পূর্বেও কার্য কারণে সৎ থাকে একথা স্বীকার করতে হয়।

আপত্তি হতে পারে যে, কারণের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না হয়েই কার্য উৎপন্ন হোক। তা খণ্ডনকল্পেই সাংখ্যকারিকায় তৃতীয় হেতুর উপস্থাপন।

তৃতীয়হেতু: (সর্বসম্ভবাভাবাৎ) – স্বীয় সিদ্ধান্ত সৎকার্যবাদের পক্ষে সাংখ্য সম্প্রদায়ের তৃতীয় যুক্তিটি হলো, একমাত্র বিশেষ কারণ থেকেই বিশেষ কার্য উৎপন্ন হয়। পশম–তন্তু থেকে পশম–বস্ত্র হয়, তিল থেকে তেল হয়। তিল থেকে পশম–বস্ত্র বা ধূলিকণা থেকে তেল হয় না। এ থেকে মনে হয়, কার্য নিশ্চয়ই উপাদান কারণে কোন না কোন ভাবে বিদ্যমান থাকে। যদি তা না থাকতো, তাহলে যে কোন কারণ থেকেই যে কোন কার্য উৎপন্ন হতে পারতো। অর্থাৎ, উপাদানের সঙ্গে সম্বন্ধহীন কার্যের উৎপত্তি স্বীকার করলে সকল কার্যের সঙ্গে সকল কারণের থেকে উৎপত্তির আপত্তি হবে। কিন্তু সংসারে এরূপ অব্যবস্থা দেখা যায় না। কোন্ কারণ থেকে কোন্ কার্য হবে নির্দিষ্টভাবে সে ব্যবস্থা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কার্য উৎপত্তির পূর্বে কারণের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে থাকে, কার্য উৎপত্তির পর কারণের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয় না। সাংখ্যমতে কারণ ও কার্যের এই সম্বন্ধ হলো তাদাত্ম্য সম্বন্ধ। অতএব, উৎপত্তির পূর্বেই কারণে কার্যের উপস্থিতি স্বীকার করতে হয়।

এ যুক্তির বিপক্ষে পূর্বপক্ষী বলতে পারেন যে, উৎপত্তির পূর্বে কার্য সৎ নয়। সুতরাং, তখন কারণে কার্যের সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু কার্য নিজের উপাদানকারণে সম্বন্ধযুক্ত না হলেও কারণব্যাপারের দ্বারা ঐ অসৎ কার্যেরই উৎপত্তি হয়, যেহেতু ঐ কারণে ঐ কার্য উৎপাদনের শক্তি আছে। অর্থাৎ, কারণত্ব সম্বন্ধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, তার শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যেমন মাটিতে ঘট জনন শক্তি থাকায় মাটি ঘটের প্রতি কারণ। পূর্বপক্ষকে নিরাস করার লক্ষ্যে সাংখ্যকারিকাকার পরবর্তী চতুর্থ হেতুটি উপস্থাপন করেন।

চতুর্থহেতু: (শক্তস্যশক্যকরণাৎ) – সৎকার্যবাদের পক্ষে সাংখ্য সম্প্রদায়ের চতুর্থ যুক্তি হলো, শক্য কারণের মধ্যেই কার্যশক্তি নিহিত থাকে। একটি কার্যের কার্যশক্তি যে কোন কারণের মধ্যে নিহিত থাকতে পারে না। এটা অবাস্তব। যে কোন কারণে যে কোন কার্যশক্তি নিহিত থাকলে কার্যের উৎপত্তির অব্যবস্থা দেখা দেয়। এজন্য স্বীকার করতে হয় যে, মৃত্তিকাই ঘটের শক্য কারণ এবং এই শক্য কারণেই

ঘটকার্যের ঘটজননশক্তি নিহিত। ঐ ঘটকার্যের সঙ্গে ঘটজননশক্তির যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তা অবশ্যই আমাদের স্বীকার করতে হবে। এই সম্বন্ধ উপপাদনের জন্য একথা স্বীকার করতে হবে যে, উপাদান কারণ মৃত্তিকাতে ঘট তথা ঘটজননশক্তি উৎপত্তির পূর্বেই বর্তমান থাকে এবং তা মৃত্তিকারই ধর্মবিশেষ। বস্তুত ঘটজননশক্তি ঘটকার্যের সম্ভাবনা ও সুপ্তাবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই শক্তিই কালক্রমে ঘটকার্যরূপে অভিব্যক্ত হয় মাত্র।অর্থাৎ, শক্তি কোন নির্দিষ্ট কারণে থাকে। যে কারণটির যে কার্যটি উৎপন্ন করার শক্তি আছে, সেই কারণটি কেবল সেই কার্যটিই উৎপন্ন করতে পারে, অন্য কোন কার্য সে উৎপন্ন করতে পারে না। কারণে নিহিত শক্তি যদি এইভাবে কেবল তার শক্য কার্যের উপরই ক্রিয়া করতে সমর্থ হয়, তাহলে স্বীকার করতে হবে যে শক্তিবিশেষ শক্যবিশেষের সঙ্গেই সম্বন্ধযুক্ত।

এক্ষেত্রে প্রতিবাদী পূর্বপক্ষীয় বলতে পারেন যে, মৃত্তিকা বা মাটি থাকলে এবং মাটির অতিরিক্ত অন্যান্য কারণ থাকলে ঘট হয়, আবার মাটি না থাকলে এবং মাটির অতিরিক্ত অন্যান্য কারণ থাকলেও ঘট হয় না। এরূপ অন্বয়–ব্যাতিরেকের দ্বারাই মাটির কারণত্ব ও ঘটের কার্যত্ব সিদ্ধ হয়। এর জন্য কার্যকারণের তাদাত্ম্যসম্বন্ধ এবং তার অনুরোধে উৎপত্তির পূর্বে কার্যের সত্ত্বস্বীকার অনাবশ্যক।

উক্ত আক্ষেপের সমাধানে ও সৎকার্যবাদের সমর্থনে সাংখ্যকারিকাকার এ বিষয়ক সর্বশেষ পঞ্চম হেতুটির উপস্থাপন করেন।

পঞ্চমহেতু: (কারণভাবাৎ) – সৎকার্যবাদের সমর্থনে সাংখ্যাচার্যগণের পঞ্চম ও চরম যুক্তি হলো, উপাদান কারণ ও কার্য বস্তুত অভিন্ন। এখানে 'ভাব' অর্থ হলো তাদাত্ম্য বা স্বরূপ। যেহেতু কার্য সর্বদা নিজের উপাদানকারণের সঙ্গে তাদাত্ম্য বা অভেদ সম্বন্ধে থাকে, সেহেতু কার্য সকল সময়েই কারণাত্মক। সৎ কারণের সঙ্গে অভিন্ন কার্য অসৎ হতে পারে না। সুতরাং কার্য সৎ।

সুবর্ণনির্মিত বলয় যেমন তার উপাদান সুবর্ণ থেকে অভিন্ন, তেমনি সকল ক্ষেত্রেই উপাদান ও তার কার্য অভিন্ন। উপাদান কারণ ও কার্য যে অভিন্ন, সাংখ্যাচার্যগণ তা একাধিক যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। যে বস্তু যা থেকে ভিন্ন, সে বস্তু তার ধর্ম হয় না। অপরদিকে যে বস্তু যার ধর্ম, সে বস্তু ঐ ধর্মের সঙ্গে অভিন্ন। পট বা বস্ত্র তন্তুর ধর্ম হওয়ায় পটকে তন্তুর সঙ্গে অভিন্ন বলতে হয়। এখানে পটকে তন্তুর ধর্ম বলতে তন্তুতে পটের বৃত্তিকে বোঝানো হয়েছে। বৃত্তি হেতু তন্তু ও পট অভিন্ন।

অনুরূপভাবে সাংখ্যাচার্যরা উপাদান–উপাদেয়ভাব, সংযোগ–প্রাপ্তাভাব ও গুরুত্বান্তর–কার্যাগ্রহণ হেতুর দ্বারাও কারণ ও কার্য যে অভিন্ন, তা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। কার্য ও কারণের মধ্যে উপাদান–উপাদেয়ভাব থাকে বলে তারা অভিন্ন হয়। আবার যাদের মধ্যে সংযোগ ও বিভাগের অভাব থাকে, তারাও অভিন্ন বলে বিবেচিত হয়। সর্বশেষে যাদের মধ্যে গুরুত্বের ভেদ থাকে না, তারা ভিন্ন হতে পারে না। কারণ ও কার্যের মধ্যে উপাদান–উপাদেয়ভাববশত কারণ ও কার্যকে অভিন্ন বলতে হয়। আবার কারণ ও কার্যের মধ্যে সংযোগ বা বিভাগ কখনো দেখা যায় না।

উভয়ই তাই অভিন্ন বলে বিবেচিত। পরিশেষে কারণ ও কার্যের গুরুত্ব বা পরিমাণগত অভিন্নতাবশত উভয়কে অভিন্ন বলে স্বীকার করতে হয়।
সাংখ্যকারিকা ও সাংখ্যসূত্রে এসব যুক্তির সাহায্যে সৎকার্যবাদে কারণ ও কার্য অভিন্ন প্রমাণিত করে কার্য যে উৎপত্তির পূর্বে কারণে বিদ্যমান থাকে তা প্রতিপাদন করা হয়েছে।

অসৎকার্যবাদ :

ন্যায়–বৈশেষিক সম্প্রদায় সাংখ্য সম্প্রদায়ের সৎকার্যবাদী সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে কার্য ও কারণকে অত্যন্ত ভিন্ন বলে দাবি করেছেন। তাঁদের মতে ক্রিয়া (উৎপত্তি), নিরোধ (ধ্বংস), ব্যপদেশ (ব্যবহার), অর্থক্রিয়াভেদ (প্রয়োজন সাধনের ভিন্নতা) এবং ক্রিয়াব্যবস্থা (প্রয়োজন সাধনের নিয়ম)- এই পঞ্চহেতুর দ্বারা কারণ ও কার্যের মধ্যে ভেদ সিদ্ধ হয়।
ন্যায়–বৈশেষিক সম্প্রদায়ের বক্তব্য হলো, উৎপত্তির পূর্বেও কার্য কারণে বিদ্যমান থাকে, একথা যদি স্বীকার করা হয়, তাহলে কার্যোৎপত্তির কোন অর্থ থাকে না। কারণ ও কার্য দুটি ভিন্ন কালে উৎপন্ন ও ভিন্ন কালে ধ্বংস হয়। সুতরাং তাদের অভিন্ন বলার পক্ষে কোন যুক্তি থাকতে পারে না। যদি বস্তুতই উৎপত্তির পূর্বে ঘট মৃত্তিকাতে থাকে, তাহলে ঘটের কার্যকরি শক্তি মৃত্তিকাতে থাকে না কেন ? ঘটের দ্বারা যে জল আনয়নাদি ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, মৃত্তিকার দ্বারা তা হয় না, পটের দ্বারা যে গাত্রনিবারণাদি ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তন্তুর দ্বারা তা হয় না।
বস্তুত প্রতিটি কার্যেরই এক একটি নির্দিষ্ট আকৃতি থাকে। কোন কার্যের নির্দিষ্ট আকৃতিহীন উপাদান কখনোই ঐ কার্যরূপে বিবেচিত হতে পারে না। ঘটাকারবিশিষ্ট মৃত্তিকাকেই ঘট বলা হয়, ঘটাকৃতিহীন মৃৎপিণ্ড কখনোই ঘট বলে বিবেচিত হয় না। কার্যবস্তুমাত্রই কতকগুলি অংশ বা অবয়বের দ্বারা নির্মিত। কারণ ও কার্য ভিন্ন না হলে অবয়ব ও অবয়বীর ভেদ উপপন্ন হয় না। বস্তুত আরম্ভক অবয়ব ও উৎপন্ন অবয়বীর ভেদ প্রত্যক্ষ–অভিজ্ঞতাসিদ্ধ। আরম্ভক অবয়বের সংখ্যার দ্বারাই অবয়বীর পরিমাণ নির্ধারিত হয়। সৎকার্যবাদ স্বীকার করলে সিদ্ধ এই অভিজ্ঞতা বাধিত অর্থাৎ বাধাপ্রাপ্ত হয়। অতএব স্বীকার করতে হয় যে, উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণে থাকে না এবং কার্য সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি।
সাংখ্য সম্প্রদায় ন্যায়াচার্যদের প্রদত্ত উপরিউক্ত যুক্তিগুলি ত্র“টিপূর্ণ বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, বস্তুর উৎপত্তি ও ধ্বংস প্রকৃতপক্ষে বস্তুর বিনাশ ও সংকোচন বা ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়। কুর্ম্মশরীরে মস্তকাদি অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ যেমন কখনো বিকশিত বা আবির্ভূত, আবার কখনো সংকুচিত বা তিরোহিত হয়, তেমনি ঘট–পটাদি কার্য কখনো আবির্ভূত ও কখনো তিরোহিত হয়। কার্যের এই আবির্ভাব ও তিরোভাবকেই উৎপত্তি ও বিনাশ বলা হয়। নতুন উৎপত্তি ও চিরকালীন বিনাশ বলে কিছু নেই। অসতের কখনো উৎপত্তি হয় না, আবার সৎ–এর কখনো বিনাশ হয় না। অর্থক্রিয়াভেদাদির দ্বারাও কারণ ও কার্যের একান্তভেদ সিদ্ধ হয় না। একই বস্তুর বহুবিধ ব্যবহার দেখা যায়, আবার একক ও সম্মিলিত শক্তিভেদে

ক্রিয়াব্যবস্থারও ব্যতিক্রম দেখা যায়। সুতরাং নৈয়ায়িকগণ যে সকল যুক্তিতে কারণ ও কার্যের অত্যন্ত ভেদ সিদ্ধ করেছেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়।

ন্যায়–বৈশেষিক দার্শনিকরা কিন্তু মনে করেন যে, সাংখ্য দার্শনিকের যুক্তিগুলির দ্বারা সৎকার্যবাদ প্রমাণিত হয় না। যা প্রমাণিত হয় তা হচ্ছে, কার্য উৎপত্তির পূর্বে অসৎ হলেও সেটি আকাশকুসুম বা বন্ধ্যাপুত্রের মতো অলীক নয়। সাংখ্যদার্শনিকরা বলেছেন অসৎ–এর উৎপত্তি হয় না। অসৎ বলতে যদি অলীক বোঝানো হয় তাহলে কথাটি ঠিক। আকাশ–কুসুম, বন্ধ্যাপুত্র, শশশৃঙ্গ ইত্যাদি অলীক পদার্থের উৎপত্তি কখনোই সম্ভব নয়। কিন্তু ঘট, পট ইত্যাদি কার্য কখনোই অলীক নয়। এই পদার্থগুলি উৎপত্তির পূর্বে অসৎ, কিন্তু উৎপত্তির পরে সৎ। উৎপত্তির পূর্বে উপাদান কারণে কার্যের যে অভাব তাকে বলা হয় প্রাগভাব। যার প্রাগভাব আছে তাকে আমরা অলীক বলতে পারি না। কারণ যে সমবায়িকারণে কার্যের প্রাগভাব আছে, সেই সমবায়ী বা উপাদান কারণ যখন আমরা প্রত্যক্ষ করি, তখন প্রাগভাবের যে বোধ আমাদের হয় তা হলো, 'এখানে কার্যটি হবে' বা 'এখানে কার্যটি এখনও হয়নি'। জ্ঞানের এই আকার থেকেই বোঝা যায়, যার অভাব উপলব্ধ হচ্ছে তা অলীক নয়। অতএব বন্ধ্যাপুত্রের মতো অলীকের উৎপত্তি অসম্ভব বলে, যা উৎপত্তির পূর্বে থাকে না, তার উৎপত্তিই হতে পারে না, একথা বলা যায় না। সাংখ্যদার্শনিকরাও বলেন যে, উৎপত্তি অর্থ হলো যা অনভিব্যক্ত ছিলো তাই অভিব্যক্ত হলো। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই অভিব্যক্তিটি কি পূর্বে ছিলো ? অভিব্যক্তিটি যদি পূর্ব থেকেই না থেকে থাকে, তাহলে বলতে হবে পূর্বে অসৎ যে অভিব্যক্তি, তাই পরে সৎ হলো। অর্থাৎ, যা ছিলো না তাই হতে পারে। কিন্তু এটা অসম্ভব।

অপরপক্ষে অসৎ অভিব্যক্তি যদি কারকব্যাপারের দ্বারা উৎপন্ন হতে পারে, তাহলে অসৎ কার্যের উৎপত্তিতেও বাধা নেই। কারণ ঘটের অভিব্যক্তিটি অসৎ হওয়া সত্ত্বেও কুম্ভকার তাকে উৎপন্ন করতে পারলে, অসৎ ঘটও কুম্ভকারের দ্বারা উৎপন্ন হতে পারবে। কিন্তু এই কল্পও অসম্ভব হওয়ায় স্বীকার করা যায় না।

আর যদি বলা হয় যে, কার্যটির মতো তার অভিব্যক্তিও পূর্ব থেকেই সৎ, তাহলে প্রশ্ন হবে, ঐ অভিব্যক্তির জন্য কারকব্যাপারের প্রয়োজন কী? অথচ কারকব্যাপারের প্রয়োজন সর্বত্রই দেখা যায়। সুতরাং, এই কল্পও গ্রহণযোগ্য নয়।

যদি বলা হয় ঐ অভিব্যক্তিটি আছে বটে, তবে কার্যের মতো তাও প্রচ্ছন্ন অবস্থায় আছে, তাহলে ঐ প্রচ্ছন্ন অভিব্যক্তির আবার অভিব্যক্তি হয়, একথা স্বীকার করতে হবে। আবার এই দ্বিতীয় অভিব্যক্তি সম্বন্ধেও প্রশ্ন করা যাবে, সেটি পূর্ব থেকে সৎ কিনা ? এক্ষেত্রে বলতে হবে যে, তাও পূর্বেই প্রচ্ছন্ন ছিলো। সেক্ষেত্রে ঐ প্রচ্ছন্ন অভিব্যক্তিরও আবার অভিব্যক্তি ঘটতে হবে। এইভাবে অনাবস্থা দোষ ঘটবে।

দ্বিতীয়ত, বিশেষ বিশেষ উপাদান থেকে বিশেষ বিশেষ কার্যের উৎপত্তিও ঐ উপাদানে পূর্ব থেকেই কার্যের সত্তা প্রমাণ করে না। আপত্তি হয়েছিলো যে যদি তিলে তেলের অভাব থাকে, মাটিতেও তেলের অভাব থাকে। তাহলে তিল থেকে তেল হয় কেন? মাটি থেকে হয় না কেন? এর উত্তর হলো, তিলে তেলের যে অভাব, তা হলো

প্রাগভাব। অপরপক্ষে মাটিতে তেলের অভাব হলো তেলের অত্যন্তাভাব। ন্যায়–বৈশেষিক মতে যেখানে কার্যের প্রাগভাব থাকে, সেখানেই কার্য উৎপন্ন হয়। কার্যের প্রাগভাব ঐ কার্যের একটি কারণ। সুতরাং, বিশেষ উপাদান থেকে বিশেষ কার্যের উৎপত্তিকে ব্যাখ্যা করার জন্য উপাদান বা সমবায়িকারণে উৎপত্তির পূর্বে কার্যের সত্তা স্বীকারের কোন প্রয়োজন নেই।

তৃতীয়ত, সাংখ্যদার্শনিকরা বলেন যে, উৎপত্তির পূর্বে কার্যের সত্তা স্বীকার না করলে উপাদান কারণের সঙ্গে কার্যের সম্বন্ধ স্বীকার করা যাবে না। কারণ, বিশেষ বিশেষ উপাদান বিশেষ বিশেষ কার্য উৎপাদনে সমর্থ একথা আমরা সকলেই স্বীকার করি। এই সামর্থই প্রমাণ করে যে, উপাদান কারণের সঙ্গে কার্যের সম্বন্ধ আছে।

এই বক্তব্যের উত্তরে ন্যায়–বৈশেষিকরা বলেন, দুটি পদার্থের মধ্যে সম্বন্ধ হতে গেলে ঐ দুটিকে বিদ্যমান হতে হবে এমন কোন কথা নেই। যেমন, আমরা সকলেই জানি যে ভবিষ্যতে আমাদের মৃত্যু হবে। সুতরাং, ভবিষ্যৎ মৃত্যু আমাদের জ্ঞানের বিষয়। কিন্তু এর দ্বারা প্রমাণ হয় না যে ভবিষ্যৎ মৃত্যুও সৎ। সম্বন্ধ নানারকম হতে পারে। দুটি বিদ্যমান পদার্থের মধ্যে যেমন সম্বন্ধ হয়, তেমনি বিদ্যমান ও অবিদ্যমান পদার্থদ্বয়েরও সম্বন্ধ হয়।

চতুর্থত, উৎপত্তির পূর্বে কার্যের উপাদানরূপে সত্তা স্বীকারের অর্থ হলো উপাদান কারণ ও কার্যকে অভিন্ন বলে মানা। কিন্তু তারা কখনোই অভিন্ন নয়, ভিন্ন। যেমন সুতোর জ্ঞান এবং কাপড়ের জ্ঞান ভিন্ন। একথা ঠিক যে গরু যেমন ঘোড়া থেকে আলাদা হয়ে থাকতে পারে, কাপড় তেমন সুতো থেকে আলাদা হয়ে থাকতে পারে না। কিন্তু এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে কাপড় ও সুতো অভিন্ন। সুতো ও কাপড়ের সম্বন্ধ যেহেতু সমবায়, সেহেতু সুতোকে ছেড়ে কাপড় থাকতে পারে না। কিন্তু এই কারণে সমবায়ের সম্বন্ধী দুটিকে অভিন্ন বলা যায় না

সাংখ্য তত্ত্বসংকলন ও তত্ত্বপরিণাম।

বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় বিভিন্ন। এই প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন নামে পরিচিত। বৌদ্ধদর্শনে প্রতিপাদ্য বিষয়কে বলা হয় 'ধাতু'। ন্যায়–বৈশেষিক দর্শনে বলা হয় 'পদার্থ'। সাংখ্য দর্শনে প্রতিপাদ্য বিষয় 'তত্ত্ব' নামে অভিহিত। এই ধাতু, পদার্থ বা তত্ত্ব জগতের মৌলিক উপাদান বলে বিবেচিত হয়।

সাংখ্য দর্শনে দুই প্রকার মূল তত্ত্ব স্বীকৃত, যথা– **নিত্য প্রকৃতি ও নিত্য পুরুষ**। এই প্রকৃতি ও পুরুষ–এর সংযোগের ফলে সাক্ষাৎ ও পরম্পরাক্রমে উৎপন্ন হয় মোট তেইশ প্রকারের তত্ত্ব। ফলে সাংখ্য দর্শনে সর্বমোট পঁচিশ প্রকার তত্ত্ব স্বীকৃত। এই তত্ত্বগুলি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নামে দার্শনিক জগতে সুবিদিত। সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণের তৃতীয় কারিকায় সাংখ্যের প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়–

'মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিঃ মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ।। (সাংখ্যকারিকা–৩)

***অর্থাৎ** : মূলপ্রকৃতি কোন তত্ত্বের বিকার বা কার্য নয়। মহৎ আদিতে যাদের এমন সাতটি তত্ত্ব (যথা– মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র কোন তত্ত্বের) কারণ এবং (অন্য কোন তত্ত্বের) কার্য। ষোলটি তত্ত্ব (যেমন– মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত) কিন্তু (কোন না কোন তত্ত্বের কেবলমাত্র) কার্য। পুরুষ (কোন তত্ত্বের) কারণও নয় এবং (অন্য কোন তত্ত্বের) কার্যও নয়।*

সাধারণ দৃষ্টিতে কারিকাটি ইঙ্গিতপূর্ণ মনে হলেও সহজ কথায় সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বা পঁচিশ প্রতিপাদ্য বিষয় হলো– (১) জ্ঞ বা পুরুষ, (২) অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতি বা প্রধান, (৩) মহৎ বা বুদ্ধি, (৪) অহংকার, (৫) মনস্ বা মন (৬) পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক– এই পাঁচটি), (৭) পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ– এই পাঁচটি), (৮) পঞ্চতন্মাত্র বা পঞ্চসূক্ষ্মভূত (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ– এই পাঁচটি), (৯) পঞ্চস্থূলভূত বা পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি বা পৃথিবী, অপ্ বা জল, তেজ বা অগ্নি, মরুৎ বা বায়ু, আকাশ বা ব্যোম্– এই পাঁচটি)।

সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ নিত্য ও অব্যক্ত। প্রকৃতি ও পুরুষ–এর সংযোগের ফলে মূলপ্রকৃতি থেকে সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরা ক্রমে সৃষ্ট হয় ব্যক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত তেইশ প্রকার তত্ত্ব। সাংখ্যকারিকার দ্বাবিংশতি বা বাইশতম কারিকায় এই উৎপত্তিক্রম দেখানো হয়েছে এভাবে–

'প্রকৃতের্মহাংস্ততোহহঙ্কারস্তস্মাদগণশ্চ ষোড়শকঃ।

তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি।। (সাংখ্যকারিকা–২২)

***অর্থাৎ** : প্রকৃতি থেকে মহৎ, মহৎ থেকে অহঙ্কার, অহঙ্কার থেকে (মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র– এই) ষোলটি গণ (বা বিকার) এবং ষোলটি বিকারের অন্তর্গত পঞ্চতন্মাত্র থেকে (আকাশাদি) পঞ্চমহাভূত (উৎপন্ন হয়)।*

সাংখ্য দর্শনে দিক্ ও কালকে পৃথক তত্ত্ব বলে স্বীকার করা হয়নি। সাংখ্যমে দিক্ ও কাল অন্যতম মহাভূত আকাশতত্ত্বের অন্তর্গত। প্রকৃতি থেকে পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় পর্যন্ত তত্ত্বসমূহকে অর্থাৎ প্রকৃতি, মহৎ, অহংকার, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় তত্ত্বগুলিকে সাংখ্য দর্শনে প্রত্যয় সর্গ বা বুদ্ধি সর্গ বলা হয়। অপরদিকে পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূতকে ভৌতিক সর্গ বলা হয়।এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে সাংখ্যশাস্ত্রে প্রধান চারটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ঈশ্বরকৃষ্ণের উপরে উদ্ধৃত তৃতীয় কারিকার ব্যাখ্যাকল্পে বাচস্পতি মিশ্র তাঁর 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী'–তে বলেন–

'সংক্ষেপতো হি শাস্ত্রার্থস্য চতস্রো বিধাঃ।

কশ্চিদর্থঃ প্রকৃতিরেব, কশ্চিদর্থো বিকৃতিরেব, কশ্চিৎ প্রকৃতিবিকৃতিরেব কশ্চিদনুভয়রূপঃ।'– (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী)

***অর্থাৎ** : (সাংখ্য) শাস্ত্রের (বিষয় বা) তত্ত্ব সংক্ষেপে চার প্রকার। কোন তত্ত্ব কেবল প্রকৃতি (বা কারণ), কোন তত্ত্ব কেবল বিকৃতি (বা কার্য), কোন কোন তত্ত্ব প্রকৃতি ও বিকৃতি উভয়ই এবং কোন তত্ত্ব প্রকৃতিও নয় বিকৃতিও নয়।*

উপরিউক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের চারটি বিভাগ হলো– (১) কেবল প্রকৃতি (কেবল কারণ), (২) কেবল বিকৃতি (কেবল কার্য), (৩) প্রকৃতি–বিকৃতি (কারণ ও কার্য) ও (৪) পুরুষ অনুভয়রূপ বা প্রকৃতিও নয় বিকৃতিও নয় (কারণও নয়, কার্যও নয়)।

(১) কেবল প্রকৃতি : মূল প্রকৃতি হলো কেবল প্রকৃতি। যে তত্ত্ব কোন তত্ত্বের বিকার বা কার্য নয়, কেবল প্রকৃতি, তথা কেবল কারণ তাকে মূলপ্রকৃতি বলে। মূল প্রকৃতি কোনকিছুর কার্য নয়, তা কেবল কারণরূপ প্রধান বলে বিবেচিত। প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থা বলে প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। আবার সকল কার্যই যেহেতু প্রকৃতিতে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, তাই প্রকৃতিকে অব্যক্তও বলা হয়। সাংখ্যমতে প্রকৃতি নিত্য, উৎপত্তিহীন চরম কারণ। প্রকৃতির কারণান্তর স্বীকার করলে অনবস্থা দোষ দেখা দেয়। এই অনবস্থা দোষাবহ ও পরিহারযোগ্য। তাই প্রকৃতিকে অকারণ ও সকল কার্যের আদি কারণ বীজস্বরূপ বলা হয়। ব্যক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত তেইশ প্রকার তত্ত্বের মূল কারণ মূলপ্রকৃতি।

(২) প্রকৃতি–বিকৃতি : যে তত্ত্ব কোন তত্ত্বের কারণ রূপ প্রকৃতি এবং অন্য কোন তত্ত্বের কার্য রূপে বিকৃতি সেটিই প্রকৃতি–বিকৃতি। মহৎ, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) এই সপ্ত তত্ত্ব প্রকৃতি–বিকৃতি, অর্থাৎ এগুলি কারণও বটে, আবার কার্যও বটে। সাংখ্যমতে প্রধান থেকে মহৎতত্ত্বের উৎপত্তি হয়, মহৎতত্ত্ব থেকে অহংকারের উৎপত্তি হয়, অহংকার থেকে একাদশ ইন্দ্রিয় (মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়) ও পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হয় এবং পঞ্চতন্মাত্র থেকে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি হয়। ফলে–

মহৎ অহংকারের কারণ রূপে প্রকৃতি এবং মূলপ্রকৃতি–র কার্য রূপে বিকৃতি। অহংকার মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র–এর কারণ রূপে প্রকৃতি এবং মহৎ–এর কার্য রূপে বিকৃতি। এবং পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চমহাভূত–এর কারণ রূপে প্রকৃতি এবং অহংকার–এর কার্য রূপে বিকৃতি।

এই কারণে মহদাদি সপ্ততত্ত্ব প্রকৃতি–বিকৃতি বলে পরিচিত।

(৩) বিকার বা কেবল বিকৃতি : যে তত্ত্ব কোন তত্ত্বের কারণ নয়, কিন্তু অন্য কোন তত্ত্বের কার্যরূপে বিকৃতি তাকে বিকার বলে। ষোলটি তত্ত্ব কেবলমাত্র কার্য, যেমন– মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় অহংকার–এর কার্য রূপে বিকৃতি এবং পঞ্চমহাভূত পঞ্চতন্মাত্র–এর কার্য রূপে বিকৃতি।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্– এই পাঁচটি হলো পঞ্চমহাভূত। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্– এই পাঁচটি হলো পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ– এই পাঁচটি হলো পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়। মন হলো উভয়–ইন্দ্রিয়। মোট এই ষোলটি তত্ত্ব

পদার্থান্তরের উপাদান কারণ হয় না, এইজন্য এগুলিকে কেবল কার্য বা বিকৃতি বলা হয়েছে।

(৪) অনুভয়রূপ বা প্রকৃতিও নয় বিকৃতিও নয় : যে তত্ত্ব কোন তত্ত্বের কারণ বা প্রকৃতিও নয় এবং অন্য কোন তত্ত্বের কার্য বা বিকৃতিও নয়, যেমন– পুরুষতত্ত্ব। যেহেতু পুরুষ কারও কার্য বা কারণ হয় না, সেহেতু পুরুষকে অনুভয়রূপ বলা হয়েছে। পুরুষ ব্যতীত সাংখ্যসম্মত চব্বিশটি তত্ত্ব সবিকার ও সক্রিয় তত্ত্ব। একমাত্র পুরুষই নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয় তত্ত্ব।

সাংখ্যমতে উপরিউক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব মূলত দ্বিবিধ তত্ত্বের অন্তর্গত। এই দ্বিবিধ তত্ত্বের একটি হলো প্রকৃতি এবং অপরটি হলো পুরুষ। এই কারণে সাংখ্য দর্শনকে বলা হয় দ্বৈতবাদী। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয় তত্ত্বই অকারণ, অলিঙ্গ এবং নিত্য। প্রকৃতি হলো বিষয় এবং পুরুষ বিষয়ী। পরিণামী প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনের নেপথ্যে পুরুষ হলো এক অপরিণামী, অপরিবর্তনীয় সত্তা। পুরুষ প্রকৃতির পরিপূরক। তাই সাংখ্য দর্শনে পুরুষকে নেতিবাচকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকৃতিতে যার অভাব, তাই পুরুষে বর্তমান। সাংখ্যকারিকার ঈশ্বরকৃষ্ণও প্রকৃতির বিরুদ্ধরূপে পুরুষকে বর্ণনা করেছেন–

'ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্মি।

ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্ ।।'– (সাংখ্যকারিকা–১১)

***অর্থাৎ** : ব্যক্ত তত্ত্ব মাত্রই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণাত্মক (হওয়ায়) ত্রিগুণ থেকে অভিন্ন, ভোগ্য বা বিষয় (অনেক পুরুষের জ্ঞানে গৃহীত হবার যোগ্য), অচেতন ও পরিমাণস্বভাব। অব্যক্ত বা প্রকৃতিও সেইরূপ। কিন্তু জ্ঞ বা পুরুষ সেইরূপ হওয়া সত্ত্বেও (ব্যক্ত ও অব্যক্ত তত্ত্ব মাত্রের) বিপরীত।*

উল্লেখ্য, ব্যক্ত (প্রকৃতি–বিকৃতি ও বিকৃতি বা বিকার) ও অব্যক্ত (মূলপ্রকৃতি বা প্রধান)-এর লক্ষণ দেখাতে গিয়ে সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণ দশম কারিকায় বলছেন–

'হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্ ।

সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীতমব্যক্তম্ ।।'– (সাংখ্যকারিকা–১০)

***অর্থাৎ** : ব্যক্ত (তত্ত্ব মাত্রই) হেতুমৎ বা কারণযুক্ত, অনিত্য, অব্যাপি বা কারণের একাংশে স্থিত, সক্রিয় বা চলনক্রিয়াযুক্ত, অনেক, আশ্রিত, লিঙ্গ বা লয়শীল ও অনুমাপক, সাবয়ব বা অবয়বযুক্ত এবং পরাধীন। তার বিপরীত (ধর্মবিশিষ্ট তত্ত্বই) অব্যক্ত।*

সাংখ্যশাস্ত্রে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বগুলিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন, সাংখ্যকারিকার (ইতোপূর্বে উদ্‌ধৃত) দ্বিতীয় কারিকায় সাংখ্যশাস্ত্রে স্বীকৃত তত্ত্বগুলিকে আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা– ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ। দ্বাবিংশতি বা বাইশতম কারিকায় প্রকৃতি ও পুরুষ–এর সংযোগের ফলে মূলপ্রকৃতি থেকে সাক্ষাৎ বা পরম্পরা ক্রমে সৃষ্ট যে তেইশ প্রকার তত্ত্বের উল্লেখ রয়েছে, যেমন– মহৎ বা বুদ্ধি, অহংকার, মনস্ বা মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়,

পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চমহাভূত, সেগুলিই ব্যক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতি এই ব্যক্ত তত্ত্বগুলির মূল–কারণ, এবং জ্ঞ বা পুরুষ এই অব্যক্ত ও ব্যক্ত তত্ত্বগুলির বিপরীত।

সাংখ্যদর্শনকে দ্বৈতবাদী ও বস্তুবাদী বলা হয়। এইমতে চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ যেমন সত্য, তেমনি জড় প্রকৃতিও সত্য। উভয়ই পরিণামশীল জড়জগতের মূল ও আদি কারণ। এককভাবে উভয়ই জগৎ সৃষ্টিতে অসমর্থ। সাংখ্যমতে পুরুষের সংস্পর্শে প্রকৃতির যে পরিণাম ঘটে, তাই জগৎ। আবার প্রলয়কালে এই জগৎ অব্যক্ত প্রকৃতিতেই লীন হয়ে যায়।

সাংখ্যের প্রকৃতিতত্ত্ব

সৎকার্যবাদী সাংখ্য দর্শন প্রকৃতিকেই জগতের আদি উপাদান ও অধিষ্ঠান বলে মনে করেন। এই মতে বিচিত্র জগৎ প্রকৃতির পরিণাম ছাড়া আর কিছুই নয়। সাংখ্যমতে, জগতের আদি কারণ কোন চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ বা জড় পরমাণু নয়। পুরুষ জগতের আদি কারণ হতে পারে না। পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ, চৈতন্য জড় জগতের কারণ হতে পারে না। আবার অপরিণামী জড় পরমাণু থেকে মন, বুদ্ধি বা অহংকারের মতো সূক্ষ্ম তত্ত্ব উৎপন্ন হতে পারে না। সুতরাং পরমাণু জগতের আদি কারণ নয়। জগতের আদি কারণ হলো পরমাণু থেকে সূক্ষ্মতর এক পরিণামশীল জড়তত্ত্ব। এই পরিণামশীল জড়তত্ত্বই প্রকৃতি, প্রধান বা অব্যক্তরূপে পরিচিত।

সাংখ্যমতে প্রকৃতি নিত্য। এই নিত্য প্রকৃতির অভিব্যক্তিই জগৎ। কারণ–প্রকৃতিতে জগৎ অব্যক্ত থাকে বলে প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলা হয়। প্রকৃতি হলো নির্বিশেষ ও নিরবয়ব। এজন্য প্রকৃতি প্রত্যক্ষগোচর নয়। প্রকৃতি হলো এক সর্বব্যাপী, অতিসূক্ষ্ম, অসীম ও জগতের আদিকারণরূপ জড়শক্তি। প্রকৃতিতে জগতের স্থিতি এবং প্রকৃতিতেই জগতের লয়। কারণরূপ প্রকৃতি অব্যক্ত ও প্রধান, এবং কার্যরূপ প্রকৃতি সৎরূপে প্রকাশিত। সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণ ষোড়শ কারিকায় প্রকৃতির স্বরূপ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন–

'কারণমস্ত্যব্যক্তং প্রবর্ত্ততে ত্রিগুণতঃ সমুদয়াচ্চ।
পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতি–প্রতি–গুণাশ্রয়–বিশেষাৎ।।'-(সাংখ্যকারিকা–১৬)

***অর্থাৎ** : অব্যক্ত প্রধান বা প্রকৃতি (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ– এই) ত্রিগুণরূপে সমবেত হয়ে কার্যাকারে পরিণত হয়। একই জল যেমন ভিন্ন ভিন্ন আধারে নানা পরিণাম প্রাপ্ত হয়, সেরূপ এক একটি গুণের প্রাধান্য অনুযায়ী ও সহকারীভেদে একই প্রকৃতি নানা পরিণাম প্রাপ্ত হয়।*

সাংখ্যমতে প্রকৃতির পরিণামের ফলে জগতের সৃষ্টি, আবার প্রকৃতির পরিণামের ফলে জগতের লয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ যখন সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন তাদের

মধ্যে পৃথক পৃথক ভাবে পরিণাম ঘটে। অর্থাৎ সত্ত্ব সত্ত্বরূপে, রজঃ রজোরূপে এবং তমঃ তমোরূপে পরিণত হয়। এরূপ পরিণামকে বলা হয় প্রকৃতির স্বরূপ পরিণাম বা সদৃশ পরিণাম। এই পরিণাম গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় ঘটে। এই সাম্যাবস্থা যখন বিনষ্ট হয়, তখন প্রকৃতিতে অপর একপ্রকার পরিণাম দেখা যায়। এই পরিণামে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ–এর পারস্পরিক শক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘটে। এর ফলে কখনও সত্ত্ব, কখনও রজঃ আবার কখনও তমঃ গুণের প্রাধান্য ঘটে। প্রকৃতির এরূপ পরিণামকে বিরূপ পরিণাম বা বিসদৃশ পরিণাম বলে। বিরূপ পরিণামের ফলে জগতের সৃষ্টি এবং স্বরূপ পরিণামের ফলে জগতের লয় সূচিত হয়।
ষোড়শ কারিকার ব্যাখ্যাকল্পে তাই বাচস্পতি মিশ্র তাঁর 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী' গ্রন্থে বলেন–

'প্রতিসর্গাবস্থায়াং সত্ত্বং রজস্তমশ্চ সদৃশপরিণামাবি ভবন্তি।

পরিণামস্বভাবা হি গুণা নাপরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্টন্তে।

তস্মাৎ সত্ত্বং সত্ত্বরূপতয়া, রজো রজোরূপতয়া, তমস্তমোরূপতয়া প্রতিসর্গাবস্থায়ামপি প্রবর্ত্ততে।'– (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী)

***অর্থাৎ** : প্রলয়কালে সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের সদৃশ পরিণাম হয়। গুণগুলির স্বভাব পরিণাম। পরিণত না হয়ে এরা ক্ষণকালও থাকতে পারে না। তাই সত্ত্ব সত্ত্বরূপে, রজঃ গুণ রজোরূপে ও তমঃ গুণ তমোরূপে প্রলয়কালেও পরিণাম প্রাপ্ত হয়।*

সাংখ্যমতে বলা হয়, প্রকৃতির লক্ষণ বা স্বভাব হলো সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থা। কিন্তু খেয়াল রাখা আবশ্যক যে, এই মতে, প্রকৃতির দুটি অবস্থা– ব্যক্ত বা কার্যাবস্থা এবং অব্যক্ত বা অকার্যাবস্থা। প্রকৃতির অকার্যাবস্থাকে বলে মূলপ্রকৃতি বা প্রধান। মূলপ্রকৃতি বা প্রধানের লক্ষণ হলো এই 'সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা' বা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থা। স্বভাবত, এটিকে প্রকৃতির লক্ষণ বললে লক্ষণটি অব্যাপ্তি দোষদুষ্ট হবে। কারণ, এই লক্ষণটি প্রকৃতির ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থা–দুটির মধ্যে কেবলমাত্র অব্যক্ত অবস্থাকে নির্দেশ করে, ব্যক্ত অবস্থাকে নির্দেশ করে না। তাই ঈশ্বরকৃষ্ণের তৃতীয় কারিকার ব্যাখ্যাকল্পে বাচস্পতি মিশ্র তাঁর সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী–তে মূলপ্রকৃতি শব্দের অর্থ নিরূপণ প্রসঙ্গে বলেন–

'মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিঃ' ইতি। প্রকরোতীতি প্রকৃতিঃ প্রধানম্ সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা। সা অবিকৃতিঃ, প্রকৃতিরেবেত্যর্থঃ।'– (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী)

***অর্থাৎ** : মূলপ্রকৃতি অবিকৃতি (অর্থাৎ কেবল কারণ, যা কোন তত্ত্বের কার্য নয়)। যিনি প্রকৃষ্ট রূপে কার্য উৎপন্ন করেন তিনিই প্রকৃতি বা প্রধান– তিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ– এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা। তিনি অবিকৃতি– অর্থাৎ তিনি কেবল কারণ।*

'প্রকৃতি' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো, প্র–করোতি বা যা প্রকৃষ্ট কারণ, তাই প্রকৃতি। সাংখ্যমতে অন্যান্য কারণের তুলনায় উপাদান কারণই প্রকৃষ্ট কারণ। সুতরাং এই জগতের যা উপাদান কারণ তাই প্রকৃতি। এই প্রকৃতির স্বরূপ হলো সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থা। এই কারণে প্রকৃতিকে ত্রৈগুণ্য বলে। যেহেতু প্রকৃতির কারণ স্বীকার করলে অনবস্থা দেখা দেয়, তাই প্রকৃতি হলো অকারণ (মূলে মূলাভাবাৎ অমূলম্ মূলম্)।

অব্যক্ত প্রকৃতির অস্তিত্বসিদ্ধি

সূক্ষ্ম প্রকৃতি যেহেতু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, সেহেতু প্রকৃতির অস্তিত্ব যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সাংখ্যমতে এই প্রকৃতির নামান্তর হলো প্রধান। এই প্রধানকে অব্যক্তও বলা হয়। অব্যক্ত প্রত্যক্ষযোগ্য নয়। এখন প্রশ্ন হলো, আকাশকুসুম, বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতির প্রত্যক্ষ না হওয়ায় তাদের অলীকত্ব যেমন সিদ্ধ হয়, অনুরূপভাবে কেন বলা যাবে না যে, প্রধানের প্রত্যক্ষ না হওয়ায় প্রধান প্রভৃতির অলীকত্ব সিদ্ধ হোক? এই আশঙ্কার উত্তরে বলা হয়েছে, প্রত্যক্ষ না হলেও তার অসত্ত্ব প্রমাণিত হয় না। প্রত্যক্ষ না হওয়া অর্থাৎ, অনুপলব্ধির বিভিন্ন কারণ আছে। যেমন– আকাশের অনেক উচ্চতায় পাখি উড়তে থাকলেও অতিদূরত্ববশত প্রত্যক্ষের দ্বারা তার উপলব্ধি হয় না। আবার অত্যন্ত নিকটে থাকায় নিজের চোখের কাজল দৃষ্টিগোচর হয় না। তৃতীয়ত, কোন ইন্দ্রিয় বিকল অর্থাৎ অপটু হলে অর্থাৎ, অন্ধত্ব, বধিরত্ব প্রভৃতি থাকলে বিদ্যমান রূপ ও শব্দ প্রত্যক্ষগোচর হয় না। চতুর্থত, অন্যমনস্কতাবশত পদার্থ প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। অন্যমনস্কতা দু'ভাবে হতে পারে। প্রথমত, মন যদি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত না হয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়, তাহলে অন্যমনস্কতা হয়। দ্বিতীয়ত, মনের যে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযোগ হওয়া প্রয়োজন, সেই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযোগ না হয়ে অন্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযোগ হলেও অন্যমনস্কতা হয়। আবার কাম, ক্রোধ এবং লোভবশত যার মন বিবশ হয়েছে, সেই ব্যক্তি অতি উজ্জ্বল আলোর মধ্যে থাকা ইন্দ্রিয়সম্বন্ধযুক্ত বিষয়কেও দেখতে পায় না। তাছাড়া অতিসূক্ষ্ম পদার্থের প্রত্যক্ষ হয় না। এই কারণে কোন ব্যক্তি একাগ্রচিত্ত হলেও এবং পরমাণু, দ্ব্যণুক, আকাশ, কাল প্রভৃতির সঙ্গে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হলেও, ঐ সকল পদার্থের প্রত্যক্ষ হয় না। এক্ষেত্রে সূক্ষ্ম শব্দের অর্থ যে দ্রব্যে মহত্ত্বের ও উদ্‌ভূতরূপের অভাব থাকে। আর দেওয়াল প্রভৃতির ব্যবধানবশত গৃহের মধ্যে থাকা পদার্থের প্রত্যক্ষ হয় না। সর্বোপরি অভিভববশত অভিভূত পদার্থের প্রত্যক্ষ হয় না।

সুতরাং, কোন বস্তুর প্রত্যক্ষ না হলেই তার অভাব সিদ্ধ হয় না। যে বস্তুটি প্রত্যক্ষযোগ্য অর্থাৎ, বস্তুটির প্রত্যক্ষের কারণগুলি আছে অথচ অতিদূরত্ব প্রভৃতি প্রতিবন্ধক নেই, সেই অবস্থায় যদি ঐ বস্তুটির প্রত্যক্ষ না হয়, তাহলে সেই বস্তুটির অভাব সিদ্ধ হয়। আলোচ্যস্থলে প্রধানের প্রত্যক্ষযোগ্যতা নেই। প্রত্যক্ষের অযোগ্য পদার্থের প্রত্যক্ষ না হলে প্রধানের অভাব সিদ্ধ হয় না।

সাংখ্যমতে প্রকৃতি হলো ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ ত্রিগুণস্বরূপ। সাংখ্যে গুণ শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ হলো সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। সত্ত্ব হলো লঘু, প্রকাশ ও সুখশক্তিবিশিষ্ট। রজঃ হলো গুরুলঘুর সমাবেশ সাধক, উপষ্টম্ভক, বাধা ও বলের সমাবেশকারক, চলনশীল এবং দুঃখাত্মক। তমঃ হলো গুরু, আবরক অর্থাৎ, প্রকাশের প্রতিবন্ধক এবং মোহস্বরূপ। গুণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাংখ্যদর্শনে বলা হয়েছে যে, এরা যথাক্রমে প্রীতি বা সুখ, অপ্রীতি বা দুঃখ এবং বিষাদ বা মোহের কারণ। জগতের যে–কোন পদার্থই হয় সুখ, না হয় দুঃখ না হয় মোহের কারণ। সুতরাং, জগৎসৃষ্টির মূল কারণ প্রকৃতিকেও সুখ–দুঃখ–মোহস্বরূপ রূপে কল্পনা করা হয়েছে।

প্রাত্যহিক জীবনে দেখা যায়, কার্য কারণগুণাত্মক, যেমন– কাপড় সুতোর গুণে অন্বিত। অনুরূপভাবে সুখদুঃখমোহাত্মক মহদাদি কার্যের কারণ অব্যক্ত প্রধানও সুখদুঃখমোহাত্মক হবে। সুতরাং কার্য কারণগুণাত্মক বলে অব্যক্ত প্রধানের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

ন্যায় ও বৈশেষিক সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ বলেন, ব্যক্ত থেকে ব্যক্ত উৎপন্ন হয়। পরমাণুগুলি ব্যক্ত। সেগুলি থেকে দ্ব্যণুক–ইত্যাদি ক্রমে স্থূল পৃথিবী ইত্যাদি–রূপ কার্য ব্যক্তের উৎপত্তি হয়। পৃথিবী ইত্যাদিতে কারণের গুণানুসারে রূপ ইত্যাদিরও উৎপত্তি হয়। অতএব, ব্যক্ত থেকে ব্যক্ত এবং তার গুণের উৎপত্তি সম্ভব হলে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অব্যক্ত কল্পনার প্রয়োজন কী ?

এরূপ আশঙ্কার উত্তরে প্রকৃতির অস্তিত্বসাধক যুক্তিগুলিকে ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর সাংখ্যকারিকার পঞ্চদশ কারিকায় প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন–

‘ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ শক্তিতঃ
প্রবৃত্তেশ্চ।কারণকার্যবিভাগাদবিভাগাদ্বৈশ্বরূপ্যস্য।। (সাংখ্যকারিকা–১৫)

***অর্থাৎ** : ভেদাদি (অর্থাৎ মহদাদি ত্রয়োবিংশতি কার্যবিশেষ বা বিভিন্ন বস্তু) পরিমিত বা পরিমাণবিশিষ্ট বলে, বিভিন্ন কারণ ও কার্যের মধ্যে (গুণের দিক থেকে) সমন্বয়ের উপস্থিতি বা সমতা থাকায়, (কারণের) শক্তি থেকে কার্যের উৎপত্তি হওয়ায়, সকল উৎপন্ন বস্তুতে (সৃষ্টি কালে) কারণ ও কার্যের বিভাগ থাকায় এবং (প্রলয় কালে) ঐরূপ বিভাগ না থাকায় সকল বস্তুর অধিষ্ঠানের প্রয়োজন হেতু অব্যক্ত প্রধান বা প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।*

উক্ত কারিকায় অব্যক্ত প্রকৃতি বা প্রধানের অস্তিত্ব স্বীকারের সমর্থনে পাঁচটি হেতুর উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন– (১) ভেদানাং পরিমাণাৎ, অর্থাৎ মহদাদি বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন পরিমাণবিশিষ্ট হেতু, (২) সমন্বয়াৎ, অর্থাৎ বিভিন্ন কারণের মধ্যে সমন্বয়ের উপস্থিতি হেতু, (৩) শক্তিতঃ প্রবৃত্তেঃ, অর্থাৎ শক্তি থেকে কার্যের উৎপত্তি হেতু, (৪) কারণকার্যবিভাগাৎ, অর্থাৎ কারণ ও কার্যের বিভাগ হেতু এবং (৫) বৈশ্বরূপ্যস্য অবিভাগাৎ, অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে ও প্রলয়ের পরে সকল বস্তুর অধিষ্ঠানের প্রয়োজন হেতু। সাংখ্যকারিকা গ্রন্থের টীকাগ্রন্থ সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী–তে বাচস্পতি মিশ্র এই পাঁচটি হেতুর সাংখ্যতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন।

প্রথম হেতু: (ভেদানাংপরিমাণাৎ)– সাংখ্যমতে কার্যবস্তু কারণে বিদ্যমান থাকে অথচ কারণ থেকে আবির্ভূত হয়ে ভিন্নভাবে প্রতীত হয়। কার্যের তুলনায় কারণ সূক্ষ্ম ও ব্যাপক। মহৎ থেকে শুরু করে সকল কার্যবস্তু কম–বেশি ব্যক্ত ও স্থূল। বলা হয় মহৎতত্ত্ব পরিমিত। অর্থাৎ, মহৎতত্ত্বে পরিমাণ থাকার জন্য মহৎতত্ত্ব চরম অব্যক্ত হবে না। যে বস্তু পরিমিত, তার উৎপত্তি অবশ্যস্বীকার্য। সুতরাং, মহৎতত্ত্বের কারণরূপে পরম অব্যক্ত অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। অহংকার অপেক্ষা মহৎতত্ত্ব অব্যক্ত হলেও প্রকৃতিই পরম অব্যক্ত। এইভাবে অনুমান প্রমাণের দ্বারাই মহৎতত্ত্বের তথা মহদাদি কার্যবস্তুর কারণরূপে পরম অব্যক্ত প্রকৃতিকে স্বীকার করতে হয়।

দ্বিতীয় হেতু: (সমন্বয়াৎ)– যদিও জগৎ বৈচিত্র্যপূর্ণ, তবুও জগতের বিচিত্র বস্তুর মধ্যে সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। সমন্বয় শব্দের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সমানরূপতা। যথা– পৃথিবী প্রভৃতি মহাভূত, গন্ধ প্রভৃতি তন্মাত্র, অহংকার, মহৎ প্রভৃতি পরস্পর ভিন্ন হলেও এদের একটা সামান্যরূপ আছে। সেই সামান্য ধর্মই হলো সুখদুঃখমোহস্বরূপতা। বুদ্ধি বা মহতের লক্ষণ হলো অধ্যবসায়, অহংকারের লক্ষণ হলো অভিমান, তন্মাত্রের লক্ষণ হলো সূক্ষ্ম গন্ধ ইত্যাদি, পৃথিবী প্রভৃতির লক্ষণ হলো স্থূলগন্ধ প্রভৃতি। প্রত্যেকটি কার্যে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ বা ধর্ম বর্তমান। এই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট কার্য পরম্পরার একটি সাধারণ ধর্ম আছে। বস্তুমাত্রই আমাদের মধ্যে সুখ, দুঃখ অথবা বিষাদ উৎপন্ন করে। তাই সেই সাধারণ ধর্মটি হলো সুখদুঃখমোহস্বরূপতা। এই সাধারণ ধর্মটি পৃথিবী প্রভৃতি প্রত্যেকটিতে থাকায় সুখ,দুঃখ, মোহ স্বরূপত্ব বিশিষ্ট অব্যক্ত কারণ অবশ্য স্বীকার্য।

সাংখ্যমতে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ– এই তিনগুণের সমন্বিত উপস্থিতিবশতই এরূপ হয়ে থাকে। জগতের প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই যদি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোর সমন্বয় ঘটে, তাহলে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণান্বিত কোন একটিমাত্র বিশেষ কারণ থেকে এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে। জগতের এই বিশেষ কারণকেই প্রকৃতি বলা হয়।

তৃতীয় হেতু: (শক্তিতঃপ্রবৃত্তেশ্চ)– কারণের শক্তি থেকে কার্য উৎপন্ন হয়। কারণ যদি অশক্ত অর্থাৎ শক্তিহীন হয় তাহলে তার দ্বারা কার্য উৎপন্ন হয় না। যেমন– তিল থেকে তেল উৎপন্ন হয়, বালি থেকে তেল উৎপন্ন হয় না। কারণ তিলে তেল উৎপাদনের শক্তি আছে, বালিতে ঐ শক্তি নেই। শক্তি থাকলে কার্য হয়, শক্তি না থাকলে কার্য হয় না– এরূপ অন্বয়–ব্যতিরেকের দ্বারা শক্তি সিদ্ধ হয়। এই শক্তি স্বীকার না করলে কোন কার্যেরই উৎপত্তি সম্ভব নয়। এই জগতের সকল প্রবৃত্তিই শক্তির দ্বারা হয়ে থাকে। এইভাবে কারণে যে শক্তি অবশ্যস্বীকার্য হয়, সেই শক্তি কোন অতিরিক্ত পদার্থ নয়, কারণনিষ্ঠ ঐ শক্তি কারণে স্থিত কার্যেরই অব্যক্ত অবস্থা। অর্থাৎ এই বৈচিত্র্যময় জগৎ, সৃষ্টির পূর্বে নিশ্চয়ই সৃষ্টিক্ষমতাসম্পন্ন কোন এক অব্যক্ত কারণে সুপ্তাবস্থায় ছিলো। যে অব্যক্ত শক্তির এই বৈচিত্র্যময় জগতের অধিষ্ঠান হবার যোগ্যতা আছে, তাই প্রকৃতি।

চতুর্থ হেতু: (কারণকার্যবিভাগাৎ)– সাংখ্যমতে কারণ ও কার্যের মধ্যে একই সঙ্গে ভেদ ও অভেদ বর্তমান। স্বর্ণনির্মিত অলঙ্কার যেমন স্বর্ণ থেকে অভিন্ন, তেমনি আবার আকৃতিপ্রাপ্ত অলংকার হিসেবে তা উপাদান স্বর্ণ থেকে ভিন্ন। পরিণামপ্রাপ্ত জগতের সকল বিষয়ের সঙ্গে যে উপাদান কারণ একই সঙ্গে ভিন্ন ও অভিন্নরূপে বর্তমান, তাই প্রকৃতি। যেহেতু কারণ থেকে কার্যের বিভাগ হয় অর্থাৎ, অভিব্যক্তি হয় ও ভিন্নরূপে প্রতীতি হয়, সেহেতু চরম কারণ অব্যক্ত অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। এই অব্যক্তই প্রকৃতি।

পঞ্চম হেতু: (অবিভাগাৎ বৈশ্বরূপ্যস্য)– বৈশ্বরূপ্য এবং বিশ্বরূপ একই অর্থ বহন করে। বিশ্বরূপ শব্দের অর্থ কার্যসমূহ। মাটি থেকে উৎপন্ন ঘট যখন বিনষ্ট হয়, তখন ঐ ঘট মাটিতে প্রবেশ করে এবং অব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই মাটি অব্যক্ত হলেও তার অব্যক্ত হওয়া আপেক্ষিক। একমাত্র প্রকৃতিই প্রকৃত অব্যক্ত। প্রকৃতি কখনো কোথাও প্রবিষ্ট বা তিরোভূত হয় না। সেই কারণে প্রকৃতি সকল কার্যের চরম অব্যক্ত। সুতরাং, উৎপত্তির পূর্বে নিজের উপাদান কারণে কার্যের বিদ্যমান থাকা এবং বিনাশের পর কার্যের নিজের উপাদান কারণে লীন হওয়া– উভয়ই অব্যক্ত অবস্থা। অতএব, বিশ্বরূপ যে অধিষ্ঠানে প্রলয়কালে বিলীন হয় এবং যে অধিষ্ঠান থেকে বিশ্বরূপ সৃষ্টি হয়, সেই অধিষ্ঠানই হলো প্রকৃতি। এভাবেই সাংখ্যদর্শনে জগৎ সৃষ্টির প্রতি উপাদানকারণরূপে প্রকৃতির অস্তিত্ব সাধিত হয়েছে।

প্রকৃতির গুণত্রয়

সাংখ্য দর্শনে ব্যক্ত ও অব্যক্তকে ত্রিগুণ এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলা হয়েছে। অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ হলো প্রকৃতির গুণত্রয়। 'গুণ' শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত 'গুণ' বলতে কোন দ্রব্যের বা বস্তুর ধর্মকে বোঝানো হয়। ন্যায়–বৈশেষিক মতে, যা দ্রব্যে সমবেত ও কর্ম থেকে ভিন্ন তাকেই গুণ বলা হয়েছে। এই মতে দ্রব্য গুণের সমবায়ী কারণ ও তার আশ্রয় বা অধিষ্ঠান। কিন্তু সাংখ্য দর্শনে 'গুণ' শব্দটি এই অর্থে গৃহীত হয়নি। সাংখ্যসম্মত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ দ্রব্যের বা বস্তুর ধর্ম নয়। এগুলি দ্রব্য এবং জাগতিক যাবতীয় দ্রব্য বা বস্তুমাত্রেরই উপাদান।

সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণ দ্বাদশ কারিকায় গুণত্রয়ের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেন–

'প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ।
অন্যোহন্যাভিভবাশ্রয়জননমিথুনবৃত্তশ্চ গুণাঃ।।'– (সাংখ্যকারিকা–১২)

***অর্থাৎ** : সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ– এই গুণগুলি সুখ, দুঃখ ও মোহ–স্বরূপ। প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও নিয়ম তাদের অর্থ বা প্রয়োজন। পরস্পরকে অভিভূত করা, পরস্পরকে আশ্রয় করা, পরস্পরের সাহায্যে বৃত্তির জনক হওয়া এবং পরস্পরের নিত্যসঙ্গী হওয়া তাদের বৃত্তি।*

আবার কোন্ গুণ কীরূপ, কেনই বা এরূপ হয়, এ প্রসঙ্গে ঈশ্বরকৃষ্ণ ত্রয়োদশ কারিকায় বলেন–

'সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ।
গুরুবরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ।।'– (সাংখ্যকারিকা–১৩)

***অর্থাৎ** : সত্ত্বগুণ লঘু, প্রকাশক ও ইষ্ট, রজোগুণ চালক, আরম্ভক ও চঞ্চল, এবং তমোগুণ ভারী ও আবরক। প্রয়োজন বা কার্য–সিদ্ধির জন্য প্রদীপের মতো তাদের বৃত্তি বা কার্য হয়।*

এই কারিকা দুটিতে প্রাপ্ত ঈশ্বরকৃষ্ণের বক্তব্য থেকে গুণত্রয়ের স্বরূপ, প্রয়োজন ও কার্য সম্বন্ধে জানা যায়।

সত্ত্বগুণ সুখাত্মক, রজঃ দুঃখাত্মক এবং তমঃ বিষাদাত্মক। সত্ত্বগুণের কার্য প্রকাশ, রজোগুণের কার্য প্রবৃত্তি এবং তমোগুণের কার্য নিয়ম বা আবরণ। গুণ মানে পরার্থ, অর্থাৎ যা অপরের অর্থ বা প্রয়োজন সাধন করে। গুণত্রয় পরস্পরবিরুদ্ধস্বভাব হলেও কার্যক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরের সহায়ক হয়। অর্থাৎ কার্যক্ষেত্রে কেউ কারোর বাধক হয় না। তিনটি গুণ কখনো একই সঙ্গে উদ্‌বুদ্ধ বা কার্যোন্মুখ হয় না। যখন একটি গুণ উদ্‌বুদ্ধ হয়, তখন অপর দুটি গুণ অভিভূত হয় বা তার বশ্যতা স্বীকার করে। তিনটি গুণ যদি একই সঙ্গে উদ্‌বুদ্ধ হতো, তাহলে তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতিবন্ধক হওয়ায় কোন কার্যই উৎপন্ন হতে পারতো না।

সত্ত্বগুণ লঘু, স্বচ্ছ ও প্রকাশক। সত্ত্বগুণ স্বভাবত লঘু হওয়ায় তা উর্ধ্বগতিসম্পন্ন। সত্ত্বগুণ সব থেকে স্বচ্ছ হওয়ায় তাতে পুরুষের সুস্পষ্ট প্রতিবিম্বন সম্ভব হয় এবং তার দ্বারা সকল বস্তু প্রকাশিত হয়। রজোগুণ উত্তেজক এবং ক্রিয়াশীল। জাগতিক সকল বস্তুর গতি, ক্রিয়া ও চঞ্চলতার জন্য রজোগুণই কারণ। তমোগুণ গুরু এবং আবরক। বস্তুত তমঃ সত্ত্বগুণের প্রকাশ এবং রজোগুণের প্রবৃত্তির নিবারক। স্বচ্ছতাবশত সত্ত্বগুণকে শ্বেতবর্ণের সঙ্গে, চাঞ্চল্যবশত রজোগুণকে রক্তবর্ণের সঙ্গে এবং আবরণবশত তমোগুণকে কৃষ্ণবর্ণের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

উল্লেখ্য, রজোগুণের প্রয়োজন প্রবৃত্তি, আর সত্ত্ব ও তমোগুণ নিজেরা ক্রিয়াহীন। রজোগুণ তাদের চালনা করে অর্থাৎ অবসর থেকে মুক্ত করে তাদের নিজ নিজ কার্যে উৎসাহ সঞ্চার করে বা যাতায়াত করে। তাই বলা হয় রজোগুণ অন্য গুণের চালক। কেন রজোগুণ এরূপ করে ? এর উত্তরে বলা হয়েছে, রজোগুণ চল অর্থাৎ ক্রিয়াস্বভাব। ক্রিয়াস্বভাব বলে রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণকে সকল কার্যে চালনা করতে গিয়ে গুরু ও আবরক এবং প্রবৃত্তির ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী তমোগুণের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কোন কোন বিষয়ে মাত্র প্রবৃত্ত হয়, সকল বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। তাই সেই সেই বিষয় থেকে ব্যাবৃত্ত করে বলে অর্থাৎ কোন কোন বিষয়ে প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক হয় বলে তমোগুণকে নিয়ামক বা আচ্ছাদক বলা হয়।

জগতের কোন বস্তুই কেবল সত্ত্ব, বা কেবল রজঃ কিংবা কেবল তমোগুণের দ্বারা গঠিত নয়। জগতের প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই ত্রিবিধ গুণ বর্তমান। তবে কোন একটি

বস্তুতে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে সত্ত্বগুণ প্রাধান্য লাভ করে, আবার কোন এক সময় রজঃ বা তমঃ গুণ প্রাধান্য লাভ করে। তৈল, বর্তি এবং অগ্নি এই তিনটির কোন একটিমাত্র যেমন প্রদীপের কার্য সম্পাদন করতে পারে না অথচ এদের পারস্পরিক সহযোগিতায় যেমন প্রদীপের কার্য সম্পন্ন হয়, তেমনি গুণত্রয়ের কোন একটির উদ্ভব এবং অপর দুটির অভিভববশত পরিণামী প্রকৃতির কার্য সম্পন্ন হয়।
মোটকথা, সাংখ্যমতে গুণগুলির প্রত্যক্ষ হয় না। সুখ, দুঃখ এবং মোহরূপ কার্যের দ্বারা গুণগুলির অনুমান হয়। সত্ত্ব গুণ হলো লঘু ও প্রকাশক। রজোগুণ চঞ্চল ও প্রেরণাদায়ক। আবার তমোগুণ হলো ভারী ও আবরণকারী। সুখ, সন্তোষ এবং প্রকাশ সত্ত্বগুণের বৈশিষ্ট্য। রজোগুণের জন্য দুঃখ এবং বিষাদ হয়। তমোগুণের আধিক্য থাকলে মোহ, জড়তা, উদাসীনতা দেখা যায়। তিনটি গুণের মধ্যে একটি ক্রিয়া করতে আরম্ভ করলে অন্যগুলি নিষ্ক্রিয় থাকে। আবার সত্ত্বগুণ স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হলেও রজোগুণ সত্ত্বকে ক্রিয়াশীল করে। কিন্তু তমোগুণ সত্ত্বের ক্রিয়াশীলতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তবে তিনটি গুণ কখনোই পরস্পরকে ছেড়ে থাকে না। এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং সহযোগিতার পারস্পরিক সহঅবস্থানই দেখা যায়।সাংখ্যমতে গুণত্রয় নিয়ত পরিণামশীল। তবে পরিণামশীল হলেও গুণত্রয় নিত্য ও সকল বস্তুর মৌলিক উপাদান বিশেষ। তারা সকল বস্তুর উৎপত্তির বা পরিণামের কারণ হলেও তাদের নিজেদের উৎপত্তি বা বিনাশ নেই।

সাংখ্যের পুরুষতত্ত্ব

সাংখ্যদর্শনে স্বীকৃত পঞ্চবিংশতি বা পঁচিশ তত্ত্বকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা– প্রকৃতি, বিকৃতি, প্রকৃতি–বিকৃতি এবং প্রকৃতিও নয় বিকৃতিও নয়। এর মধ্যে সাংখ্যদর্শনের পুরুষ হলো চতুর্থপ্রকার তত্ত্ব। প্রকৃতি অর্থ কারণ, বিকৃতি অর্থ কার্য। সাংখ্যমতে পুরুষ কারণও নয়, কার্যও নয়। পরিণামী প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনের নেপথ্যে পুরুষ হলো এক অপরিণামী অপরিবর্তনীয় সত্তা। পুরুষ প্রকৃতির পরিপূরক। তাই সাংখ্য দর্শনে পুরুষকে নেতিবাচক ভাবে দেখানো হয়েছে। প্রকৃতিতে যার অভাব, তাই পুরুষে বর্তমান। আবার বিপরীতভাবে প্রকৃতি যে সকল ধর্মবিশিষ্ট, তার কোন কোন ধর্মের অভাবাধিষ্ঠানই হলো পুরুষ।
প্রকৃতি বৈচিত্র্যের বীজরূপ হলেও তা একটি বিশেষ ধর্মবর্জিত। এই ধর্মটি হলো চৈতন্য। বিপরীতক্রমে ঐ চৈতন্যধর্মই পুরুষের স্বরূপধর্ম। ন্যায়–বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতো সাংখ্যের পুরুষ কেবল চৈতন্যগুণসম্পন্ন দ্রব্য নয় এবং চৈতন্য পুরুষের আগন্তুক গুণ নয়। সাংখ্যমতে পুরুষ চৈতন্যময়। এদিক থেকে সাংখ্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে অদ্বৈতবেদান্ত সম্প্রদায়ের মতৈক্য পরিলক্ষিত হয়। অদ্বৈতবেদান্তে পুরুষকে চিন্ময়সত্তা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে বেদান্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাংখ্য সম্প্রদায়ের পার্থক্য হলো, সাংখ্য সম্প্রদায় যেখানে পুরুষকে চিন্ময় বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন, সেখানে অদ্বৈতবেদান্ত সম্প্রদায় চিন্ময় পুরুষকে সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ (সচ্চিদানন্দ) বলে উল্লেখ করেছেন।

অন্যান্য সম্প্রদায়ের আত্মতত্ত্বের বিরোধিতা করে সাংখ্য সম্প্রদায় নিত্য কালত্রয়–অবাধিত, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, পাপপুণ্যহীন স্বসম্মত পুরুষতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রে যাকে সাধারণত আত্মা শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়, তাকেই সাংখ্যদর্শনে পুরুষ শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়েছে। সাংখ্যকারিকার একাদশকারিকায় সাংখ্যের প্রকৃতি বা প্রধান থেকে পুরুষের ভেদ প্রতিপাদিত হয়েছে–

'ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি।

ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্ ।।'– (সাংখ্যকারিকা–১১)

***অর্থাৎ** : ব্যক্ত–এর ধর্ম হলো ত্রিগুণত্ব, অবিবেকিত্ব, বিষয়ত্ব, সামান্যত্ব, অচেতনত্ব, প্রসবধর্মিত্ব। অব্যক্ত বা প্রকৃতিও সেইরূপ। কিন্তু এই গুণগুলির কোনটিই জ্ঞ বা পুরুষে থাকে না। পুরুষ হলো ব্যক্ত ও অব্যক্তের বিপরীত।*

অতএব, পুরুষ হলো অত্রিগুণ, বিবেকী, অ–বিষয়, অ–সামান্য, চেতন, অ–প্রসবধর্মী। অর্থাৎ, পুরুষ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব। পুরুষের বন্ধনও নেই, মোক্ষও হয় না। অত্রিগুণত্ব, বিবেকীত্ব, অবিষয়ত্ব, অসাধারণত্ব, চেতনত্ব এবং অপ্রসবধর্মীত্ব এই ধর্মগুলির মধ্যে চেতনত্ব এবং অবিষয়ত্বের দ্বারা পুরুষের সাক্ষীত্ব এবং দ্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হয়। কারণ চেতনই দ্রষ্টা হয়, অচেতন দ্রষ্টা হয় না। যাকে বিষয় দর্শন করানো হয়, সেই সাক্ষী হয়। অন্যে যাকে নিজ বিষয় প্রদর্শন করে, দর্শনের ব্যাপারে যার নিজের কোন সক্রিয়তা নেই, তাকেই সাক্ষী বলা হয়। পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ বলে তার দেখবার বা জানবার শক্তি রয়েছে, কিন্তু তার ক্রিয়াশক্তি নেই। লোকে যেমন বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের বিবাদের বিষয় সাক্ষীকে দেখায়, অর্থাৎ সাক্ষীর নিকট উপস্থাপন করে, সেভাবেই প্রকৃতি যখন নিজ রূপকে পুরুষের সম্মুখে উপস্থাপন করে, তখন পুরুষ সেইরূপ প্রকৃতিকে দর্শন করে মাত্র।

অত্রৈগুণ্যের জন্য পুরুষের কৈবল্য সিদ্ধ হয়। দুঃখত্রয়ের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক অভাবই কৈবল্য। এই কৈবল্য পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম। অত্রৈগুণ্য বা সুখদুঃখমোহ–রহিত বলে কৈবল্য পুরুষের অনায়াস–সিদ্ধ। এই অত্রৈগুণ্য থাকায় পুরুষ মধ্যস্থ অর্থাৎ নিরপেক্ষ। কারণ সুখী ব্যক্তি সুখের দ্বারা তৃপ্তি লাভ করে বলে এবং দুঃখী ব্যক্তি দুঃখের প্রতি দ্বেষ করে বলে মধ্যস্থ হতে পারে না। এই উভয় রহিত অর্থাৎ সুখদুঃখরহিত যে, তাকেই মধ্যস্থ বা উদাসীন বলা হয়। ফলে প্রকৃতির রূপ দর্শনে পুরুষ সাক্ষী হলেও স্বভাবতই পুরুষ উদাসীন। আর বিবেকীত্ব এবং অপ্রসবধর্মীত্ব থেকে পুরুষ যে অকর্তা– এটা সিদ্ধ হয়। তাই সাংখ্যকারিকার উনবিংশ কারিকায় বলা হয়েছে–

'তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎসিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরষস্য।

কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃত্বমকর্তৃভাবশ্চ।।'– (সাংখ্যকারিকা–১৯)

অর্থাৎ : *সেই (ব্যক্ত ও অব্যক্তের) বিপর্যয় ও বৈপরীত্য–বশত এই পুরুষের উদাসীন নির্লিপ্তভাব, দ্রষ্টার ভাব, কেবল একাকীত্বের (শুদ্ধ–চৈতন্যের) ভাব, মধ্যস্থের ভাব এবং অকর্তাভাব সিদ্ধ হয়।*

উল্লেখ্য, প্রমাণের দ্বারা কর্তব্য বিষয় জেনে 'চেতন আমি এটা করতে চাই বলে করছি'– এভাবে পুরুষ ও চেতনার একত্র অবস্থান সবাই অনুভব করে বলে মনে করা হয়। কিন্তু সাংখ্যমতে তা সম্ভব হয় না। কারণ চেতন পুরুষ কর্তা নয় এবং কর্তা বুদ্ধিও চেতন নয়। এজন্যেই সাংখ্যকারিকার বিংশতি কারিকায় বলা হয়েছে–

'তস্মাত্তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্ ।

গুণকর্তৃত্বে চ তথা কর্তেব ভবত্যুদাসীনঃ।।'– (সাংখ্যকারিকা–২০)

অর্থাৎ : *সেইহেতু, পুরুষের সংযোগবশত অচেতন মহদাদি চেতনার মতো মনে হয় এবং ত্রিগুণের কর্তৃত্বশত উদাসীন পুরুষ কর্তার মতো প্রতিভাত হন।*

সাংখ্যমতে আবার পুরুষ সর্বব্যাপী ও সংখ্যায় বহু। অবিবেকবশত পুরুষ বদ্ধাবস্থাপ্রাপ্ত হয়। বদ্ধ পুরুষকে তাই একভাবে অবিবেকী বলা যায়। পুরুষের অবিবেক বিনাশ্য এবং তা বিনাশের মাধ্যমে পুরুষ মোক্ষ বা কৈবল্য লাভ করে। সাংখ্যকারিকার একবিংশ কারিকায় বলা হয়েছে–

'পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।

পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ।।'– (সাংখ্যকারিকা–২১)

অর্থাৎ : *পুরুষের মুক্তির জন্য এবং প্রধানের (তথা মূল প্রকৃতির) ভোগের জন্য পঙ্গু ও অন্ধের মতো উভয়ের (অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির) সংযোগ হয়। (পুরুষ ও প্রকৃতির) সংযোগবশত মহদাদি ব্যক্ত জগতের সৃষ্টি হয়।*

সাংখ্যমতে সম্ভবত এখানেই জগৎসৃষ্টির মূল কারণটি লুকিয়ে আছে। স্বভাবসুলভ নিত্য মুক্ত উদাসীন দ্রষ্টা পুরুষের এই সংযোগ আপাতদৃষ্টে বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে। তাই এ কারিকাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাচস্পতি মিশ্র তাঁর 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী' টীকাগ্রন্থে বলেন–

'পুরুষস্যাপেক্ষাং দর্শয়তি– 'পুরুষস্য কৈবল্যার্থম্' ইতি।

তথাহি ভোগ্যেন প্রধানেন সম্ভিন্নঃ পুরুষস্তদগতং দুঃখত্রয়ং স্বাত্মন্যভিমন্যমানঃ কৈবল্যং প্রার্থয়তে।

তচ্চ সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিনিবন্ধনম্ ।

ন চ সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিঃ প্রধানমন্তরেণেতি কৈবল্যার্থং পুরুষঃ প্রধানমপেক্ষতে।

অনাদিত্বাচ্চ সংযোগপরম্পরায়া ভোগায় সংযুক্তোহপি কৈবল্যায় পুনঃ সংযুজ্যত ইতি যুক্তম্ ।'– (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী)

***অর্থাৎ** : (প্রকৃতির সঙ্গে) পুরুষের (সংযোগের) অপেক্ষার (পক্ষে) যুক্তি দেখানো হয়েছে, 'পুরুষের কৈবল্যের জন্য' ইত্যাদি। প্রধানের সঙ্গে মিলিত হয়ে পুরুষ প্রধানের ধর্ম দুঃখত্রয়কে নিজের বলে মনে করে সেই দুঃখত্রয় থেকে মুক্তি প্রার্থনা করে। সেই কৈবল্য বুদ্ধি ও পুরুষের অন্যথাখ্যাতি (বা বিভেদজ্ঞান) থেকে হয়। বুদ্ধি ও পুরুষের অন্যথাখ্যাতি প্রধান ছাড়া হয় না। (অতএব) কৈবল্যের জন্য পুরুষ প্রধানকে অপেক্ষা করে। (পুরুষ ও প্রকৃতির) সংযোগ–পরম্পরা অনাদি বলে (পুরুষ) ভোগের জন্য (প্রকৃতির সঙ্গে) সংযুক্ত হয়েও কৈবল্যের জন্য পুনরায় সংযুক্ত হয়– এটাই যুক্তিযুক্ত।*

পুরুষের অস্তিত্বসিদ্ধি

সাংখ্যাচার্যরা পুরুষের অস্তিত্ব বিষয়ে অনেক হেতুযুক্ত অনুমান প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। সাংখ্যমতে প্রমাণ ত্রিবিধ– প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ বা আগম প্রমাণ। প্রশ্ন হলো, অনুমান ছাড়াও পুরুষ কি প্রত্যক্ষ ও শব্দ প্রমাণের দ্বারাও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ? এ প্রশ্নের উত্তরে সাংখ্যাচার্যদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ ঘটতে দেখা যায়। পুরুষের অস্তিত্ববিষয়ে অনেক শ্র"তিবাক্য রয়েছে। তাই পুরুষের অস্তিত্ব বিষয়ে শব্দ বা আগম প্রমাণ নিয়ে বিশেষ বিচার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু প্রত্যক্ষ বিষয়ে অনেক সাংখ্যাচার্য ভিন্নমত পোষণ করেছেন। অজ্ঞাত রচয়িতা যুক্তিদীপিকাকার পুরুষ প্রত্যক্ষসিদ্ধ নয় বলে মনে করেন। কিন্তু সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু পুরুষকে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলে মনে করেন। ব্যাস–ভাষ্যে বলা হয়েছে, প্রত্যক্ষের আলম্বনরূপে পুরুষ প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলে গৃহীত হয়। তবে পুরুষ প্রত্যক্ষসিদ্ধ হোক বা না–হোক, তা যে অনুমানসিদ্ধ হতে পারে, সে বিষয়ে সকলেই একমত। দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে পদার্থসিদ্ধির ব্যাপারে অনুমানই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। তাই সাংখ্যাচার্যরা প্রধানত অনুমান বা যুক্তির সাহায্যেই পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণে প্রয়াসী হয়েছেন।
.গুণযুক্ত পরিণামী জড়বস্তুই সাধারণ জীবের প্রত্যক্ষের বিষয়। ত্রিগুণাত্মক জড়বস্তুকে পক্ষ করে বিভিন্ন হেতুর সাহায্যে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তারূপ চেতন পুরুষের অস্তিত্ব অনুমিত হতে পারে। সাংখ্যসূত্রকার মহর্ষি কপিল বলেছেন–

'আস্ত্যাত্মা নাস্তিত্ব সাধনাভাবাৎ।'

***অর্থাৎ** : আত্মার নাস্তিত্ব সাধক প্রমাণ না থাকায় আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না।*

কারণ, আত্মার অস্তিত্ব নিষেধ করতে সচেষ্ট হলে সেই নিষেধের কর্তা ও কর্মরূপে আত্মার অস্তিত্বই সিদ্ধ হয়। সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর সপ্তদশ কারিকায় পঞ্চবিধ হেতুর সাহায্যে সাংখ্যসম্মত চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণের অভিপ্রায়ে বলেছেন–

'সংঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াদধিষ্ঠানাৎ।

পুরুষোহস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ।'– (সাংখ্যকারিকা–১৭)

***অর্থাৎ** : সংঘাতবস্তু অপরের প্রয়োজন সাধন করে থাকে, ত্রিগুণ ইত্যাদির বিপরীত কেউ আছে, কোন চেতন অধিষ্ঠাতা ছাড়া জড়বর্গ চলতে পারে না, রূপরসাদি ভোগ্যবস্তুর ভোক্তা আছে, এবং কেবল বা শুদ্ধ আত্মার ভাব কৈবল্য বা মোক্ষ লাভের জন্য চেষ্টা আছে বলে পুরুষ আছেন– এটাই প্রমাণিত হয়।*

পুরুষের অস্তিত্ব সাধক হিসেবে কারিকাটিতে যে পাঁচটি হেতু বা যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে, তা হলো– (১) সংঘাত পরার্থত্বাৎ, অর্থাৎ সংঘাত বস্তু অপরের প্রয়োজনসাধক হেতু, (২) ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াৎ, অর্থাৎ ত্রিগুণাদি বস্তুর বৈপরীত্য হেতু, (৩) অধিষ্ঠানাৎ, অর্থাৎ জড়বস্তুর অধিষ্ঠান হেতু, (৪) পুরুষোহস্তি ভোক্তৃভাবাৎ, অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুর ভোক্তা হেতু, (৫) কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ, অর্থাৎ বন্ধন হতে মুক্তিলাভের বা কৈবল্যের প্রচেষ্টা হেতু।

আশঙ্কা হতে পারে যে, যারা পুরুষের অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকারই করেন তাঁদের কাছে পুরুষের অস্তিত্ব সাধক অনুমান সিদ্ধসাধন দোষদুষ্ট হবে। কারণ প্রতিবাদী যা স্বীকার করেন বাদী যদি অনুমানের দ্বারা তারই সিদ্ধি করেন, তাহলে সিদ্ধসাধন দোষ হয়।

এই আশঙ্কার উত্তরে বলা যে, উক্ত হেতুগুলির দ্বারা কেবল পুরুষের অস্তিত্ব সিদ্ধ করা হয়নি, কিন্তু অব্যক্ত ইত্যাদি থেকে অতিরিক্ত পুরুষের অস্তিত্বই উক্ত হেতুগুলির দ্বারা সিদ্ধ করা হয়।

প্রথম হেতু: (সংঘাত পরার্থত্বাৎ) – সাংখ্যকারিকা অনুসারে পুরুষের অস্তিত্বসাধক প্রথম অনুমানটি হবে, পুরুষ অস্তিত্বশীল যেহেতু সংঘাতমাত্রই অন্যের প্রয়োজন সিদ্ধ করে। যে পদার্থ মিলিতভাবে কার্য করে তাকেই সংঘাত বলা হয়। জড় পদার্থমাত্রই অন্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে কার্য করে, এইজন্য জড়পদার্থমাত্রকে সংঘাত বলা হয়েছে। এই অনুমানে পুরুষ পক্ষ, অস্তিত্ব সাধ্য এবং সংঘাতপরার্থত্ব হলো হেতু।

আশঙ্কা হতে পারে যে, উক্ত অনুমানটি স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাস দোষে দুষ্ট। কারণ পক্ষে হেতু না থাকলে স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাস হয়। এক্ষেত্রে পক্ষ পুরুষে সংঘাত পরার্থত্ব হেতু না থাকায় স্বরূপাসিদ্ধি দোষ হয়।

এই স্বরূপাসিদ্ধি দোষ পরিহারের জন্য সাংখ্যকারিকার টীকা সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী গ্রন্থে অনুমানটি বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। অনুমানটি এইরূপ– অব্যক্ত মহৎ প্রভৃতি পরার্থ, যেহেতু তারা সংঘাত, যেমন শয্যা, বস্ত্র, আসন, ঘট, পট প্রভৃতি। যেখানে যেখানে সংঘাতত্ব, সেখানে সেখানে পরার্থত্ব– এটিই উক্ত অনুমানের ব্যাপ্তি। অর্থাৎ, যে সকল বস্তু সংঘাত তারা অপরের প্রয়োজন সাধন করে। শয্যা, আসন, ঘট, পট প্রভৃতি সংঘাত পদার্থ অচেতন এবং এরা সর্বদা অপরের প্রয়োজনই

সিদ্ধ করে। প্রকৃতি এবং তার পরিণামজাত সকল পদার্থই সংঘাত বা সংহত বা মিলিত। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সমাহারই হলো প্রকৃতি। এই সংঘাতপদার্থ কোন চেতন সত্তার প্রয়োজনেই সংঘাত বা উপাদানের দ্বারা উৎপন্ন হয়ে থাকে। এই সকল সংঘাত যার প্রয়োজন সিদ্ধ করে, সেই সংঘাতভিন্ন চেতন সত্তাই পুরুষ।

দ্বিতীয় হেতু: (ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াৎ) – উপরিউক্ত যুক্তির বিরুদ্ধে আপত্তি হতে পারে যে, উক্ত অনুমান অর্থান্তরতা দোষে দুষ্ট। কারণ যে সাধ্যের সাধনে অনুমানটি প্রযুক্ত হয়, ঐ অনুমানটি যদি সেই সাধ্যের সাধন না করে অন্য সাধ্যের সাধন করে, তাহলে অর্থান্তরতা দোষ হয়। আমরা বার বার প্রত্যক্ষ করে থাকি যে, একটা সংঘাত অপর সংঘাতেরই প্রয়োজন সিদ্ধি করে, আত্মা বা পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধ করতে পারে না। আত্মার নিদ্রা, বসা প্রভৃতি যদি প্রয়োজন হতো, তাহলে শয্যা, আসন প্রভৃতি আত্মার প্রয়োজন সিদ্ধি করতে পারতো। কিন্তু নিদ্রা, বসা প্রভৃতি শরীরের প্রয়োজন। শয্যা, আসন প্রভৃতি সেই প্রয়োজনই সিদ্ধ করে। সুতরাং, সংঘাতরূপ পদার্থ পরার্থ হলেও সেই অপর সংঘাত বিশেষই হয়। অর্থাৎ একটি সংঘাতপদার্থ অপর একটি সংঘাতপদার্থের প্রয়োজন সাধন করতে পারে, এর জন্য সংঘাত–অতিরিক্ত কোন চেতন সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন নেই।

উক্ত আপত্তি খণ্ডনের উদ্দেশ্যেই সাংখ্যকারিকাকার এই দ্বিতীয় হেতুটি বলেছেন। কেননা, যদি এরূপ কথা স্বীকার করা হয় যে, একটি সংঘাতপদার্থ অপর একটি সংঘাতপদার্থেরই প্রয়োজন সাধন করে, তাহলে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, ঐ দ্বিতীয় সংঘাতপদার্থ পুনরায় অন্য কোন সংঘাতপদার্থের প্রয়োজন সাধন করে। কিন্তু এরূপ বলা হলে সংঘাত–পরম্পরায় শেষ পর্যন্ত অনবস্থা দোষ দেখা দিতে বাধ্য। সুতরাং এই অনবস্থাদোষ পরিহারের জন্য আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, যে সত্তার প্রয়োজন প্রকৃতিজাত তত্ত্বের দ্বারা সাধিত হচ্ছে, সেই সত্তা স্বরূপত সংঘাতপদার্থ থেকে ভিন্ন। 'বিপর্যয়' শব্দের অর্থ অভাব। সংঘাতপদার্থ ত্রিগুণাত্মক। অতএব ত্রিগুণাদিবিপর্যয় বলতে ত্রিগুণের অভাব বা ত্রিগুণশূন্যতা বুঝতে হবে। সংঘাতপদার্থ যার প্রয়োজন সাধন করে, সেই পুরুষসত্তা অ–ত্রিগুণাত্মক। আবার একই যুক্তিতে ত্রিগুণাত্মক বস্তু জড় ও অপ্রকাশস্বভাব হওয়ায় পুরুষকে চেতন ও প্রকাশস্বভাব বলে স্বীকার করতে হয়।

তৃতীয় হেতু: (অধিষ্ঠানাৎ) – ত্রিগুণাত্মক বস্তুমাত্রই কোন একজন নিয়ামকের অপেক্ষা রাখে। জড় পদার্থের অনন্ত পরিণামের ব্যাখ্যার জন্য অধিষ্ঠান হিসাবে পুরুষ স্বীকার্য। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণ তিনটি জড়। জড় কখনও স্বয়ং ক্রিয়াশীল হতে পারে না। সুতরাং, ঐ সকল জড় পদার্থের অধিষ্ঠানরূপে পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার কার প্রয়োজন। পুরুষ অধিষ্ঠাতা না হলে জড়পদার্থগুলির ঐরূপ পরিণাম নিয়মিতভাবে কখনোই হতো না। এখানে অধিষ্ঠাতা বলতে প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সম্বন্ধ বিশেষই বোঝায়। কিন্তু পুরুষ, প্রকৃতি প্রভৃতি ঐরূপ পরিণামের কর্তা নয়। পুরুষের সান্নিধ্য বা সম্বন্ধই প্রকৃতি প্রভৃতির পরিণামের হেতু। যেভাবে চালকের বা ঘোড়ার সান্নিধ্যবশত রথ চলে, সেভাবেই পুরুষের সান্নিধ্যবশত প্রকৃতি প্রভৃতির

পরিণাম হয়। অতএব প্রকৃতি এবং প্রকৃতির পরিণামরূপ যাবতীয় বস্তুর নিয়ামকরূপে চেতন পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। অচেতন ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি চেতন পুরুষের সান্নিধ্য ব্যতীত বিশ্বসৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতি যে বিশ্বসৃষ্টিতে সক্রিয়, তা সিদ্ধ। অতএব প্রকৃতির অধিষ্ঠানরূপে চেতন পুরুষ স্বীকার করতেই হবে।

চতুর্থ হেতু: (পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ) – সুখ, দুঃখ ও বিষাদ কোন না কোন কর্তার দ্বারা উপলব্ধ হয়ে থাকে। যে কোন অভিজ্ঞতাই কোন এক কর্তার অভিজ্ঞতা। কর্তাকে বাদ দিয়ে কোন অভিজ্ঞতার কথা চিন্তা করা যায় না। জাগতিক বস্তুর অভিজ্ঞতা প্রকৃতি বা প্রকৃতির পরিণামী কোন বস্তুর দ্বারা হতে পারে না। কারণ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি ও তার পরিণামী সকল বস্তুই জড় ও অচেতন। অব্যক্ত ও ব্যক্ত সুখদুঃখমোহস্বরূপ হওয়ায় অচেতন। এইজন্য ব্যক্ত অব্যক্তকে ভোগ করতে পারে না এবং অব্যক্ত ব্যক্তকে ভোগ করতে পারে না। অতএব একজন ভোক্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা প্রয়োজন। বস্তুর ভোগ করার ক্ষমতা নেই, অতএব সুখ, দুঃখ ও বিষাদের অনুভূতি কোন এক চেতন সত্তারই হয়ে থাকে। যে চেতন সত্তার সুখ–দুঃখাদি ভোগ হয়, সেই চেতন সত্তাই হলো পুরুষ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'ভোগ' শব্দটি সাংখ্য দর্শনে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বস্তুজগৎ সম্বন্ধে চেতন সত্তার সর্ববিধ অভিজ্ঞতাই 'ভোগ' শব্দের দ্বারা বোঝায়। এই অর্থে পুরুষ শুধু সুখ–দুঃখাদির ভোক্তা নন, পুরুষ প্রকৃতিভূত যাবতীয় বস্তুর ভোক্তা, দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা। অপরদিকে প্রকৃতিজাত যাবতীয় পদার্থই ভোগ্য, দৃশ্য ও জ্ঞেয়।

আশঙ্কা হতে পারে যে, পুরুষের অস্তিত্ব সিদ্ধ হওয়ার আগে ভোক্তৃত্ব ধর্ম পুরুষের অস্তিত্বে হেতু হবে কীভাবে ?

উত্তরে বলা হয়, ভোক্তৃভাব পদের দ্বারা ভোগ্য সুখদুঃখকে বোঝানো হয়েছে। ভোগ্যরূপ সুখদুঃখকে প্রত্যেক আত্মা অনুভব করে থাকে। সুখ অনুকুল বেদনীয় এবং দুঃখ প্রতিকুলবেদনীয়। সুখদুঃখ যেহেতু ভোগ্য সেহেতু ঐগুলির অতিরিক্ত এক ভোক্তা স্বীকার করা প্রয়োজন। ভোগ্য কখনও ভোক্তা হতে পারে না। সুতরাং যিনি ভোক্তা হবেন, তাকে সুখ দুঃখ মোহস্বরূপ বস্তু থেকে অতিরিক্ত বলতে হবে। ঐ ভোক্তাই পুরুষ।

এখানে আশঙ্কা হতে পারে, সুখদুঃখ অনুকূল বেদনীয় এবং প্রতিকূল বেদনীয় হওয়ায় মহৎতত্ত্ব প্রভৃতিই ঐ সুখদুঃখের ভোক্ত হোক। সুতরাং, তার অতিরিক্ত পুরুষ স্বীকার করার প্রয়োজন নেই।

এই আশঙ্কার উত্তরে বলা হয়, অতিরিক্ত পুরুষ স্বীকার করা না হলে এক্ষেত্রে কর্তৃকর্মবিরোধ উপস্থিত হবে। কর্তৃত্ব ও কর্মত্ব একই অধিকরণ বা আশ্রয়ে থাকতে পারে না। সুখ–দুঃখ মোহস্বরূপ বুদ্ধি প্রভৃতি ভোগকর্মত্বরূপ ভোগ্যত্ব এবং ভোগকর্তৃত্বরূপ ভোক্তৃত্বের আশ্রয় হতে পারে না। সুতরাং সুখদুঃখের ভোগ্যত্বের জন্য যে ভোক্তার অস্তিত্ব অবশ্যস্বীকার্য, সেই ভোক্তাই পুরুষ।

প্রসঙ্গত, পুরুষ ভোক্তা কী না তা বিচার করা প্রয়োজন। আপাতদৃষ্টিতে সাংখ্যের পুরুষকে ভোক্তা বলা যায় না। কারণ ভোক্তৃত্ব কর্তৃত্বসাপেক্ষ। সাংখ্যমতে পুরুষ কর্তা হতে পারে না যেহেতু পুরুষ নিষ্ক্রিয়। আবার প্রকৃতির ভোক্তৃত্বও স্বীকার করা যায় না, কারণ প্রকৃতি হলো অচেতন। কেবলমাত্র চেতনেরই ভোগ ও অপবর্গ সম্ভব, অচেতনের ভোগ ও অপবর্গ সম্ভব নয়। এই কারণে বলা যায় পুরুষের ভোক্তৃত্ব স্বীকার্য। সাংখ্যকারিকার টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র তাঁর সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে পুরুষের এই ভোগকে স্বাভাবিক না বলে ঔপচারিক বা আরোপিত বলেছেন। তাঁর মতে পুরুষ স্বভাবতই মুক্ত। প্রকৃত ভোগ বুদ্ধি বা অন্তঃকরণের। বুদ্ধি সঙ্গে পুরুষের অভেদ প্রতীতিবশত বুদ্ধির ভোগ পুরুষের বলে প্রতিভাত হয়। পুরুষ স্বরূপত উদাসীন। প্রশ্ন হতে পারে, ভোক্তৃত্ব প্রকৃতিতে অথবা মহতে না থাকায় আরোপিত হবে কীভাবে?

উত্তরে বলা হয়, মহৎ ও পুরুষের অনাদি অবিবেকবশতই পুরুষে ভোক্তৃত্বের প্রকাশ হয়ে থাকে। বিবেকের অগ্রহ বা অজ্ঞানই অবিবেক। অবিবেকের ফলেই ভোক্তৃত্ব আরোপিত হয়ে থাকে।

পঞ্চম হেতু: (কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ) – সাংখ্যমতে, কৈবল্যের জন্য প্রবৃত্তি হওয়ায় পুরুষের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। শাস্ত্রসমূহকে অভ্রান্ত বলা হয়। শাস্ত্রে দুঃখ–নিবৃত্তির উপায়ের নির্দেশ আছে। সমাধি–প্রজ্ঞালব্ধ সত্যদ্রষ্টা করুণাপরায়ণ ঋষিরা দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে জেনেছিলেন যে, দুঃখ–নিবৃত্তির দ্বারাই দুঃখ–জর্জরিত জীবের পরম কল্যাণ সাধিত হতে পারে। এই কারণেই তাঁরা মোক্ষ বা কৈবল্যের উপদেশ দিয়েছেন। কৈবল্য শব্দের অর্থ আত্যন্তিক দুঃখত্রয়ের উপশম। এই কৈবল্য প্রকৃতি বা প্রকৃতি থেকে উদ্‌ভূত কোন বস্তুর হতে পারে না। প্রকৃতি তথা প্রকৃতিজাত বস্তু ত্রিগুণাত্মক হওয়ায় তাদের দুঃখ থেকে চিরনিবৃত্তি কখনোই সম্ভব নয়।

সাংখ্যদর্শনে ত্রিবিধ দুঃখের কথা বলা হয়েছে– আদিদৈবিক, আদিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক। পুরুষ নামক তত্ত্ব স্বীকার করা না হলে কৈবল্যের প্রবৃত্তি হতে পারে না। কারণ ঐরূপ প্রবৃত্তি মহৎ ইত্যাদির দ্বারা সম্ভব নয়, যেহেতু মহৎ প্রভৃতি পদার্থ হলো দুঃখাদিস্বরূপ। দুঃখ যদি মহৎ প্রভৃতির স্বরূপগত হয় তাহলে দুঃখের আত্যন্তিক উপশম বা নিবৃত্তি কখনোই সম্ভব হয় না। কারণ দুঃখস্বরূপ পদার্থকে দুঃখ থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। মহৎ প্রভৃতিকে দুঃখ থেকে বিচ্ছিন্ন করলে মহৎ প্রভৃতির নাশ স্বীকার করতে হবে। এই কারণে, যেহেতু কৈবল্য বা মুক্তির প্রবৃত্তি হয়, সেহেতু মহৎ ইত্যাদির অতিরিক্ত অ–দুঃখাত্মক পুরুষ অবশ্যস্বীকার্য। সুতরাং সাংখ্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হলো, শাস্ত্রের ও মহর্ষিদের কৈবল্যের প্রবৃত্তির জন্য মহৎ প্রভৃতি থেকে অতিরিক্ত পুরুষ বা আত্মা আছে।

বস্তুত উপরিউক্ত পঞ্চবিধ হেতুর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, ভোগ ও অপবর্গের তাৎপর্য প্রকৃতি তথা প্রকৃতিজাত কোন বস্তুর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। ভোগ ও অপবর্গের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে হলে প্রকৃতির অতিরিক্ত চেতন সত্তা স্বীকার করা প্রয়োজন। এইরূপ চেতন সত্তাই সাংখ্য দর্শনে ‘পুরুষ’ বলে অভিহিত হয়েছে।

সাংখ্যসম্মত বহুপুরুষতত্ত্ব বা পুরুষের বহুত্ব

পুরুষের অস্তিত্ব প্রতিপাদনের পর প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হলো, পুরুষ কি সকল শরীরে এক না শরীর ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে ?

সাংখ্যমতে পুরুষ বহু। পুরুষ স্বভাবত সর্বব্যাপি হলেও শরীরবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। একটি ঘরে শত দীপ একসঙ্গে জ্বললেও তারা যেমন পরস্পরের অবিরোধে অবস্থান করে অর্থাৎ কেউ কারোর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না, তেমনি জীবভাবাপন্ন অনেক পুরুষ পরস্পরের অবিরোধে অবস্থান করতে পারে। একটি দীপ প্রজ্বলিত করা হলে বা নির্বাপিত হলে অন্যান্য দীপ যেমন তার সাথে প্রজ্বলিত হয় না বা নির্বাপিত হয় না, তেমনি একটি পুরুষের বন্ধনে বা মুক্তিতে অপর পুরুষের বন্ধন বা মুক্তি হয় না। পুরুষ প্রতি শরীরের ভিন্ন হওয়ায় একটি পুরুষের সুখ–দুঃখ, শোক–সন্তাপ, জন্ম–মরণ প্রভৃতি ভোগ অন্য পুরুষের সুখ–দুঃখ, শোক–সন্তাপ, জন্ম–মরণ ভোগের সহায়ক বা ব্যাঘাত্মক হয় না।

এ বিষয়ে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা প্রভৃতি সম্প্রদায় একমত। কেবলমাত্র বেদান্ত দর্শন এই মতের বিরোধী। বেদান্তমতে আত্মা বহু নয়। এই মতে একই আত্মা উপাধিযুক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন জীবে পরিণত হয়। তাই এই মতে জীব অসংখ্য, কিন্তু আত্মা অসংখ্য নয়, এক।

শরীর ভেদে পুরুষের বহুত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর অষ্টাদশ কারিকায় বলেন–

'জনন–মরণ–করণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ।

পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াচ্চৈব।।'– (সাংখ্যকারিকা–১৮)

***অর্থাৎ** : জন্ম–মরণ ও ইন্দ্রিয়সমূহের পৃথক পৃথক অস্তিত্বের জন্য, পৃথক পৃথক ভাবে অন্তঃকরণের চেষ্টা বা যত্নের জন্য এবং ত্রিগুণের বিশেষ বা তারতম্যবশত পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হয়।*

কারিকাটিতে পুরুষের বহুত্ব স্বীকারের পক্ষে তিনটি যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে– (১) জননমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাৎ, অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু ও ইন্দ্রিয়াদি করণের প্রতিনিয়ম হেতু, (২) অযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ, অর্থাৎ অযুগপৎ প্রবৃত্তি হেতু, (৩) ত্রৈগুণ্যবিপর্যয়াৎ, অর্থাৎ ত্রিবিধ গুণের তারতম্য হেতু।

প্রথম হেতু: (জননমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাৎ) – এই যুক্তি অনুসারে, প্রত্যেক পুরুষের জন্ম, মৃত্যু এবং অন্তকরণ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় পুরুষের বহুত্ব অবশ্যস্বীকার্য। পুরুষ বহু। পুরুষ যদি এক হতো, তাহলে একজনের জন্ম বা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অপর সকলের জন্ম বা মৃত্যু হতো। প্রতিটি জীবের জন্ম, মৃত্যু এবং অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ বিশেষ বিশেষ প্রকারের হয়ে থাকে। একজনের অঙ্গহানি হলে অর্থাৎ কোন একজন মূক, বধির বা অন্ধ হলে অপর সকলেই যে মূক, বধির বা অন্ধ হবে, তাও নয়। বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকারের জন্ম, মৃত্যু ও করণের জন্য তাই বহু পুরুষ

স্বীকার করতে হয়। আশঙ্কা হতে পারে যে, জন্ম শব্দের প্রচলিত অর্থ উৎপত্তি এবং মৃত্যু শব্দের প্রচলিত অর্থ বিনাশ। পুরুষ অনাদি, অনন্ত অর্থাৎ নিত্য। তার উৎপত্তি ও বিনাশ হতে পারে না। সুতরাং যেহেতু পুরুষ জন্ম প্রভৃতির অতীত, সেহেতু জন্ম–মৃত্যুকে পুরুষবহুত্বের হেতু বলা উচিত নয়।

উক্ত আশঙ্কার উত্তরে বলা হয়, এই স্থলে 'জন্ম' ও 'মরণ' শব্দের দ্বারা পুরুষের উৎপত্তি বা বিনাশকে বোঝানো হয়নি। পুরুষ অপরিণামী নিত্য। সুতরাং তার উৎপত্তিরূপ জন্ম বা বিনাশরূপ মৃত্যু হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে সাংখ্যকারিকার টীকাগ্রন্থ সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে বাচস্পতি মিশ্র বলেন–

'নিকায়বিশিষ্টাভিরপূর্ব্বাভির্দেহ ইন্দ্রিয়মনোহহঙ্কারবুদ্ধি বেদনাভিঃ পুরুষস্যাভিসম্বন্ধো জন্ম, ন তু পুরুষস্য পরিণামঃ তস্য হি অপরিণামিত্বাৎ। তেষামেব চ দেহাদীনামুপাত্তানাং পরিত্যাগো মরণম্, ন ত্বাত্মানো বিনাশঃ, তস্য কূটস্থনিত্যত্বাৎ। করণানি বুদ্ধ্যাদীনি ত্রয়োদশ। তেষাং জন্মমরণকরণানাং প্রতিনিয়মো ব্যবস্থা। সা খল্বিয়ং সর্ব্বশরীরেষ্বেকস্মিন্ পুরুষে নোপপদ্যতে।'– (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী)

***অর্থাৎ** : নিকায় বিশিষ্ট (অর্থাৎ মনুষ্যত্বাদি জাতি বিশিষ্ট) নতুন দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, অহংকার, বুদ্ধি ও সংস্কারের সঙ্গে পুরুষের সম্বন্ধকে জন্ম বলে। পুরুষের পরিণামরূপ জন্ম হয় না, তার অপরিণামিত্বের জন্য। এরূপ সম্বন্ধযুক্ত (অর্থাৎ নিকায়–বিশিষ্ট) উপাত্ত দেহাদির পরিত্যাগকে মৃত্যু বলে। আত্মার কিন্তু মৃত্যু হয় না, তার কুটস্থ–নিত্যত্ব স্বভাবের জন্য। বুদ্ধি ইত্যাদি ইন্দ্রিয় তেরোটি। জন্ম, মৃত্যু ও ইন্দ্রিয়গুলির প্রত্যেকের পৃথক পৃথক ব্যবস্থা আছে। সকল শরীরে একই আত্মা স্বীকার করলে সেই ব্যবস্থা বা নিয়মের উপপত্তি হয় না।*

যখন দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, অহংকার, বুদ্ধি ও বুদ্ধির পরিণামস্বরূপ জ্ঞান পরস্পর মিশ্রিতভাবে একক প্রয়োজন সাধক হয়, তখন তাকে বলা হয় নিকায়। ঐ নিকায় যদি নতুন হয়, তাহলে ঐ নিকায়কে বলা হয় অপূর্ব–নিকায়। এইরূপ অপূর্ব–নিকায়ের সঙ্গে অভিসম্বন্ধই হলো পুরুষের জন্ম। অভিসম্বন্ধ হলো অভিমানস্বরূপ সম্বন্ধ, সংযোগ সম্বন্ধ নয়। নিকায়ের সঙ্গে অভিসম্বন্ধবশত পুরুষে ভোক্তৃভাব আরোপিত হয়। নিকায়ের বহুত্বহেতু পুরুষেরও বহুত্ব সিদ্ধ হয়। জনম, মরণ ও করণসমূহের সঙ্গে প্রত্যেক পুরুষের নিয়মিত সম্বন্ধ বা ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থা পুরুষ এক হলে কখনোই সম্ভব হতে পারে না। একটিমাত্র পুরুষের ভোগ ও অপবর্গের পক্ষে একটি মাত্র নিকায়েই যথেষ্ট। তারপরও যদি একই পুরুষের সঙ্গে অনেক নিকায়ের সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, তাহলে একটি পুরুষের নিকায় পরিত্যাগে সকল নিকায়ের পরিত্যাগ স্বীকার করতে হবে। অর্থাৎ সকল শরীরে একই আত্মা স্বীকার করলে একজন জন্মালে সকলেই জন্মাবে, একজন মারা গেলে সকলেই মারা যাবে। একজন অন্ধ, কালা ইত্যাদি হলে সকলেই অন্ধ, কালা ইত্যাদি হবে এবং

একজন উন্মাদ হলে সকলেই উন্মাদ হবে। এভাবে অব্যবস্থা হবে। এবং তা বাস্তব অভিজ্ঞতা–বিরোধী। অতএব স্বীকার করতে হবে পুরুষ বহু।

দ্বিতীয় হেতু: (অযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ)– প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি হওয়ায়, পুরুষও ভিন্ন ভিন্ন হয়। প্রবৃত্তি অর্থ হলো ক্রিয়াজনক প্রযত্ন। এই প্রযত্ন যুগপৎ সকল শরীরে একরূপ নয়। কোন বিষয়ের প্রতি পুরুষের প্রবৃত্তি বিভিন্ন প্রকার হয়। ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি হয়, তেমনি একই বিষয়ের প্রতি একই পুরুষের প্রবৃত্তিও কালভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। মোটকথা, পুরুষের প্রবৃত্তি বিচিত্র। পুরুষের বহুত্ব স্বীকার না করলে প্রবৃত্তির এই বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করা যায় না। অযুগপৎ প্রবৃত্তির জন্য প্রতিশরীরে পুরুষভেদ স্বীকার না করলে আত্মা একটা শরীরে প্রযত্নবান হলে সেটি সকল শরীরে প্রযত্নবান হবে। সকল শরীরে একই আত্মা স্বীকার করলে সেই পুরুষ একই সময়ে সকল শরীরকে চালিত করবে। কিন্তু এটা প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ হওয়ায় স্বীকার করা যায় না। সুতরাং, বহুপুরুষ অবশ্যস্বীকার্য।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, প্রবৃত্তি–ভেদ–বশত পুরুষের ভেদ কিরূপে সিদ্ধ হয় ? এর উত্তরে বাচস্পতি মিশ্র বলেন–

'প্রবৃত্তিঃ প্রযত্নলক্ষণা যদ্যপ্যন্তঃকরণবর্ত্তিনী তথাহপি পুরুষ উপচর্য্যতে।'– (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী)

***অর্থাৎ** : অন্তঃকরণের ধর্মরূপ প্রবৃত্তি পুরুষে আরোপিত হয়েই পুরুষের ভেদ সাধন করে।*

সাংখ্যমতে প্রযত্ন অন্তঃকরণের ধর্ম। অবিবেকী বদ্ধপুরুষের সঙ্গে অন্তঃকরণের ভেদাগ্রহ থাকায় অন্তঃকরণস্থিত প্রযত্ন পুরুষে আরোপিত হয়। স্ব–স্বামিভাববশত অন্তকরণস্থিত প্রযত্নকে অন্তঃকরণের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত পুরুষের প্রযত্ন বলা হয়। এরূপ প্রযত্ন সকল অন্তঃকরণে যুগপৎ হয় না। আবার পুরুষের সঙ্গে সম্বন্ধহীন শরীরেও প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং স্বীকার করতে হয় যে, বিভিন্ন অন্তঃকরণের সঙ্গে বিভিন্ন পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধবশতই অযুগপৎ প্রবৃত্তি সম্ভব হয়।

তৃতীয় হেতু: (ত্রৈগুণ্যবিপর্যয়াৎ)– ত্রৈগুণ্য অর্থ হলো সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ– এই তিনটি গুণ। বিপর্যয় অর্থ হলো বৈচিত্র্য। অর্থাৎ গুণত্রয়ের নানাবিধ বৈচিত্র্যের জন্য পুরুষের বহুত্ব স্বীকার্য। ব্যবহারিক জীবনে যেমন আমরা সত্ত্বগুণের আধিক্যহেতু সাত্ত্বিক ব্যক্তিকে সুখী থাকতে দেখি, রজোগুণের আধিক্যহেতু রাজসিক ব্যক্তিকে অসুখী থাকতে দেখি, আবার তমোগুণের আধিক্যহেতু তামসিক ব্যক্তিকে মোহাচ্ছন্ন দেখি। এইভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন গুণের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। একেই ত্রিগুণের বিপর্যয় বলা হয়। সকল শরীরে যদি একই আত্মা বিরাজিত বলা হয়, তাহলে এইরূফ ভেদ–ব্যবহার উপপন্ন হয় না। আবার এ জগতে যখন কেউ জন্ম–যন্ত্রণা ভোগ করে, তখন অন্য কেউ বা মৃত্যু–যন্ত্রণা ভোগ করে। জন্ম–যন্ত্রণা ও মৃত্যু–যন্ত্রণা অত্যন্ত বিলক্ষণ। একই আত্মা বা পুরুষ একই ক্ষণে এইরূপ দুটি বিপরীত অনুভূতির ভোক্তা হতে পারে না। সুতরাং আমাদের স্বীকার করতে হয় যে,

প্রতিটি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ বা আত্মা সুখ–দুঃখাদি ভোগ করে থাকে। সুতরাং পুরুষবহুত্ব অবশ্যস্বীকার্য।
অষ্টাদশ কারিকায় তিনটি হেতু বা যুক্তির সাহায্যে পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু সাংখ্যকারিকায় পুরুষ শব্দটি একবারও বহুবচন–এ ব্যবহার করা হয়নি। প্রশ্ন হতে পারে, পুরুষ যদি বহু হতো, সর্বদাই কেন ঐ শব্দটি একবচন–এ ব্যবহার করা হয়েছে ? তাছাড়া পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধি কী বেদ বা শ্র"তির অদ্বৈত সিদ্ধান্তের বিরোধী নয় ? আস্তিক সাংখ্য কীভাবে শ্র"তি বিরোধী হতে পারে ?
এসব প্রশ্নের উত্তর সাংখ্যকারিকার টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র দেননি। তবে 'সাংখ্যপ্রবচনসূত্র'–এ এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে এই সূত্রে –

'নাদ্বৈত শ্রুতিবিরোধঃ জাতিপরত্বাৎ।'– (সাংখ্যপ্রবচনসূত্র)

***অর্থাৎ** : সাংখ্য পুরুষ–বহুত্ব স্বীকার করলেও শ্র"তি বিরোধী নয়, কারণ সাংখ্যমতে পুরুষ ব্যক্তি হিসেবে বহু হলেও জাতি হিসেবে এক।*

ঈশ্বরপ্রসঙ্গে সাংখ্যমত

দার্শনিক মহলে মহর্ষি কপিল প্রবর্তিত সাংখ্য দর্শনকে নিরীশ্বর সাংখ্য এবং পতঞ্জলি প্রবর্তিত যোগ দর্শনকে সেশ্বর সাংখ্য বলা হয়। তবে এটি সর্বসম্মত মত নয়। কেননা, সাংখ্য দর্শন নিরীশ্বরবাদী কিনা, সে বিষয়ে সাংখ্য দার্শনিকদের মধ্যেই মতভেদ রয়েছে। বলা হয়, প্রাচীন সাংখ্যাচার্যরা নিরীশ্বরবাদী এবং পরবর্তী সাংখ্যাচার্যরা ঈশ্বরবাদী।
ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রসঙ্গে সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে বলা হয়েছে –

'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ।'– (সাংখ্যপ্রবচনসূত্র–১/৯২)

***অর্থাৎ** : প্রমাণের অভাবে ঈশ্বর অসিদ্ধ।*

এক্ষেত্রে উক্ত সূত্রটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁর সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে বলেন– 'প্রমাণের অভাবে ঈশ্বর অসিদ্ধ'– এই উক্তি থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে, সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বর অস্বীকৃত হয়েছেন। বরং, এর দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হলেও কোন প্রমাণের দ্বারা তা সিদ্ধ বা প্রমাণ করা যায় না। এখানে উল্লেখ্য, ষোড়শ শতকের ঈশ্বরবাদী সাংখ্য দার্শনিক বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁর সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যের ভূমিকায় বলেই দিয়েছিলেন যে,-
'সাংখ্যশাস্ত্র কালসূর্যের গ্রাসে পতিত হয়েছে এবং তার কলামাত্রই অবশিষ্ট আছে; আমি অমৃতবাক্যের দ্বারা তা পূরণ করবো।'
সাংখ্যের কলামাত্র অবশিষ্টকে অমৃতবাক্যের দ্বারা পূর্ণ করার ফলাফল সম্পর্কে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়–এর প্রাসঙ্গিক উদ্‌ধৃতিটিও প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয়।
'...তার ফলে এ–দর্শন আর যাই হোক সাংখ্য–দর্শন থাকেনি– বেদান্তমতে বা অন্তত প্রায়–বেদান্তমতে পরিণত হয়েছিলো। কেননা, নিরীশ্বর সাংখ্যকে সেশ্বর দর্শনে পরিণত করেই তিনি ক্ষান্ত হননি; শেষপর্যন্ত তিনি বেদান্তের সঙ্গে সাংখ্যের প্রায়

সমস্ত মৌলিক প্রভেদই উড়িয়ে দেবার আয়োজন করেছিলেন।'– (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা–২৩)

নিরীশ্বর সাংখ্যকে সেশ্বর সাংখ্যে রূপায়ন–প্রচেষ্টা পরবর্তীকালের অন্যান্য ঈশ্বরবাদী ভাষ্যকারদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। যেমন সাংখ্যের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক তত্ত্ব পুরুষতত্ত্বে সাংখ্যকারিকা অনুযায়ীই পুরুষ–বহুত্ব স্বীকৃত হলেও সাংখ্যকারিকার অন্যতম ভাষ্যকার গৌড়পাদ তাঁর গৌড়পাদভাষ্যে সংশ্লিষ্ট কারিকার ব্যাখ্যায় ঠিক বিপরীত মত–ই প্রস্তাব করেছেন যে

(সূত্র– দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা–২৪)

'অনেকং ব্যক্তমেকব্যক্তং তথা পুমানপ্যেকঃ।'– (গৌড়পাদভাষ্য)

***অর্থাৎ** : ব্যক্ত অনেক, অব্যক্ত এক, সেই প্রকার পুরুষও এক।*

প্রাচীন আধ্যাত্মবাদী বা ব্রহ্মবাদী দার্শনিকদের কাছে সাংখ্য যে কেবল নিরীশ্বরবাদী দর্শনই ছিলো, তা–ই নয়, বেদ বা শ্র"তিবিরোধী দর্শন হিসেবেও বিবেচিত হয়েছে। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের বিখ্যাত অদ্বৈত–বেদান্তবাদী দার্শনিক শংকরাচার্যও প্রাচীন আস্তিক মতের সমর্থনে সাংখ্যকে বেদমূলক দর্শন বলে স্বীকার করতে সম্মত হননি। প্রাচীন আস্তিক মতের প্রধান দার্শনিক উদ্যোক্তা হলেন 'ব্রহ্মসূত্র'–প্রণেতা বাদরায়ণ। বাদরায়ণও সাংখ্য–দর্শনকে বেদান্ত–দর্শনের অর্থাৎ উপনিষদ বা শ্রুতি–প্রতিপাদ্য তত্ত্বের প্রধানতম প্রতিপক্ষ বলেই গ্রহণ করেছিলেন।

'সাংখ্য–গণিতের একটি সরল হিসেব থেকেই এ–কথা স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। ব্রহ্ম–সূত্রে মোট ৫৫৫টি সূত্র আছে। তার মধ্যে অন্তত ৬০টি সূত্র প্রধানতই সাংখ্য–খণ্ডন উদ্দেশ্যে রচিত। তুলনায় বাকি সব বিরুদ্ধ–মত খণ্ডনের উদ্দেশ্যে বাদরায়ণ মোট ৪৩টি সূত্র রচনা করেছেন; তার মধ্যে জৈন–মত খণ্ডনে মোট ৪টি সূত্র। এবং সমস্ত রকম বৌদ্ধমত খণ্ডনে মোট ১৫টি সূত্র দেখা যায়। এই হিসেবটুকু থেকেই বোঝা যায় সূত্রকারের কাছে বিরুদ্ধ–মত হিসেবে সাংখ্যর গুরুত্ব কতখানি ছিল। সাংখ্য যদি প্রকৃতই শ্রুতি –মূলক হয় তা হলে শ্রুতি–তত্ত্বর ব্যাখ্যায় সাংখ্য–খণ্ডনে এমন উৎসাহ কেন?'- (ভারতীয় দর্শন,পৃষ্ঠা–২২, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)

তাছাড়া ব্রহ্মসূত্রের মূল পরিকল্পনায়ও দেখা যায়, গ্রন্থের শুরুতে প্রথম চারটি সূত্রে বাদরায়ণ ব্রহ্ম বিষয়ে কয়েকটি মূল কথা ব্যাখ্যা করে এরপর পঞ্চম সূত্রেই বলেছেন

'ঈক্ষতেঃ ন অশব্দম্ ।'– (ব্রহ্মসূত্র: ১/১/৫)

***শংকরাচার্যেরব্যাখ্যানুযায়ীসূত্রটিরঅর্থ**:*

জগতের আদি কারণের চিন্তা, দর্শন ইত্যাদির কথা শাস্ত্রে আছে– এই ব্রহ্ম চেতন–পদার্থ। কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত অচেতন প্রধানের কথা শাস্ত্রে নাই বলে অচেতন প্রকৃতি বা প্রধানকে জগৎসৃষ্টির আদি কারণ বললে তা অশাস্ত্রীয় উক্তি হবে।

মোটকথা, আধুনিক বিদ্বানদের মতে, আদিতে বেদ–রিরুদ্ধ দর্শনের মধ্যে সাংখ্যের স্থানই প্রধান ছিলো। লুপ্তপ্রায় মূল গ্রন্থের অভাবে পরবর্তীকালের ঈশ্বরবাদী

দার্শনিকদের হাতে তার ব্যাখ্যাগুলি নিজেদের মতো করে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান অবস্থায় এসেছে। প্রকৃতপক্ষে আদিতে সাংখ্য দর্শনের জন্ম হয়েছে নিরীশ্বরবাদী দর্শন হিসেবেই। সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ নেই। এমনকি সায়ন মাধবাচার্যও তাঁর 'সর্বদর্শনসংগ্রহ'–এর সাংখ্য–প্রস্থান শেষ করেছেন এই বলে যে –

'এতচ্চ নিরীশ্বরসাংখ্যশাস্ত্রম্ ।'– (সাংখ্য–প্রস্থানম্, সর্বদর্শনসংগ্রহ)

***অর্থাৎ** : এইভাবে নিরীশ্বর সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবর্তক কপিলের মত প্রদর্শিত হলো।*

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রসঙ্গে সাংখ্য দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদের প্রেক্ষিতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিপক্ষে ও পক্ষে সাংখ্য দর্শনে বিভিন্ন যুক্তির উপস্থাপন ঘটেছে।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিপক্ষে যুক্তি

প্রাচীন সাংখ্য দার্শনিকদের মতে ঈশ্বর বলে কেউ নেই, প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ। এই মতবাদ স্থাপনের জন্য তারা ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিপক্ষে কতকগুলি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন।

(১) সাংখ্যমতে মহৎ তত্ত্ব থেকে মহাভূত পর্যন্ত এই জগৎ সৃষ্টি প্রকৃতিরই কার্য। কার্য থাকলে এর পেছনে কারণও থাকবে। পরিণামী প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ। তাই জগৎ–কারণরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার পক্ষে কোন যুক্তি নেই।

(২) কোন কর্ম সম্পাদনে কর্তার একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। জগৎ কারণরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হলে জগৎ সৃষ্টির দ্বারা ঈশ্বরের কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে, তা বলতে হয়। কিন্তু জগৎ সৃষ্টির মাধ্যমে ঈশ্বরের কোন উদ্দেশ্য সাধনের কথাই আমরা বলতে পারি না।

প্রথমত, জীবের প্রতি করুণাবশত ঈশ্বও জগৎ সৃষ্টি করতে পারেন না, কারণ জগৎ সৃষ্টির পূর্বে জীবের প্রতি করুণার প্রশ্নই ঊঠে না। আর যদি তিনি জীবের ভাবী কল্যাণের কথা ভেবে জগৎ সৃষ্টি করতেন, তাহলে জগতে বহুবিধ দুঃখের আবির্ভাব হতো না। দ্বিতীয়ত, জগৎ সৃষ্টির মাধ্যমে ঈশ্বরের কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না, কারণ তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। পূর্ণ ঈশ্বরের কোন অপূর্ণ ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। সুতরাং জীবের প্রতি করুণা বা ব্যক্তিগত কোন স্বার্থসিদ্ধি জগৎ সৃষ্টির প্রতি ঈশ্বরের প্রবৃত্তির নিয়ামক হতে পারে না।

(৩) ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করলে তাঁকে পুরুষ রূপেই স্বীকার করতে হয়। কিন্তু ঈশ্বর মুক্ত বা বদ্ধ কোন পুরুষ রূপেই স্বীকৃত হতে পারেন না। তিনি যদি বদ্ধ পুরুষ হন, তাহলে তিনিও দুঃখ–ত্রয়ের অধীন হবেন। কিন্তু ঈশ্বর কখনো দুঃখের অধীন হতে পারেন না। আবার ঈশ্বর যদি মুক্ত হন তাহলে তাঁকে নিত্য–মুক্তই বলতে হয়। তিনি যদি নিত্য–মুক্তই হন, তাহলে জগতের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না।

প্রাচীন সাংখ্যাচার্যদের উপরিউক্ত যুক্তির সাহায্যে বাচস্পতি মিশ্র, অনিরুদ্ধ প্রমুখ দার্শনিকরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী। এই মতে, অচেতন প্রকৃতি

স্বভাববশেই জগৎ রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। তার এইরূপ স্বভাবের কারণ হলো পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ সম্পাদন। গোবৎসের নিমিত্ত যেমন গাভীর দুগ্ধ ক্ষরণ হয়, তেমনি সাংখ্যকারিকার একবিংশ কারিকা অনুযায়ী– ('পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য) পুরুষের ভোগ ও মোক্ষের নিমিত্তই প্রকৃতি পরিণাম প্রাপ্ত হয়। এই পরিণামের কারণরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি

সাংখ্য দার্শনিকদের মধ্যে কোন কোন আধুনিক ব্যাখ্যাকার ঈশ্বর সম্বন্ধে উপরিউক্ত নিরীশ্বরবাদী সাংখ্যমত গ্রহণ করেন নি। যেমন– বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে সাংখ্য ঈশ্বরবাদী। তিনি মনে করেন, সাংখ্যপ্রবচনসূত্রকার ঈশ্বরের নাস্তিত্বের কথা কোথাও বলেন নি। ঈশ্বরের নাস্তিত্বই যদি সূত্রকারের অভিপ্রেত হতো, তাহলে তিনি প্রমাণের অভাবে ঈশ্বর অসিদ্ধির কথা না বলে সরাসরি ঈশ্বরের নাস্তিত্বের কথাই বলতেন। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে, সূত্রকারের বক্তব্য থেকে একথাই মনে হয় যে, সাংখ্য সম্প্রদায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও ন্যায়–বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতো জগৎস্রষ্টারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের বিরোধী।

ঈশ্বরবাদী সাংখ্যাচার্যদের মতে, ঈশ্বর হলেন আদি পুরুষ। পুরুষ নিষ্ক্রিয় হওয়ায় জগৎ সৃষ্টি তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তাঁরই ইচ্ছায় প্রকৃতির মধ্যে চাঞ্চল্য ঘটে এবং প্রকৃতি ক্রিয়াশীল হয়। চুম্বকের সান্নিধ্যে লৌহ যেমন চুম্বকধর্মবান বলে প্রতিভাত হয়, তেমনি চৈতন্যময় পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতিতে চেতনার প্রতিফলন ঘটে। এর ফলে প্রকৃতিতে চাঞ্চল্য দেখা দেয় এবং জগৎরূপে প্রকৃতির পরিণাম ঘটে। তাই প্রকৃতির গতিময়তার হেতুরূপে সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যেতে পারে। তাছাড়া স্মৃতি ও শ্রুতি থেকেও ঈশ্বরের অস্তিত্বেও কথা জানতে পারা যায়।

সাংখ্যমতে মোক্ষ বা কৈবল্য |

...সাংখ্যমতে, আত্মা বা পুরুষে যে সুখ–দুঃখ–মোহাদিরূপ প্রাকৃতিক ধর্ম উপচারিত হয়, তার তিরোধানই হলো মুক্তি। এই মুক্তি–প্রাপ্তিকে সাংখ্য দর্শনে কৈবল্য–প্রাপ্তি বলা হয়, এবং এই কৈবল্যই সাংখ্য দর্শনে পরম পুরুষার্থ।

মহর্ষি কপিল বা অন্যান্য সাংখ্যাচার্যগণ ত্রিতাপ দুঃখভোগকে আত্মার বন্ধনের ফল বলেছেন। এই ত্রিতাপ দুঃখ কী? সকল জীবই এ সংসারে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক– এই ত্রিবিধ দুঃখভোগ করে। শারীরিক ও মানসিক দুঃখ হলো আধ্যাত্মিক দুঃখ। বজ্রপাত, ভূকম্পন প্রভৃতি দৈব–দুর্বিপাক বশত জীবের যে দুঃখ হয়, তাকে বলে আধিদৈবিক দুঃখ। মানুষ ও অন্যান্য পশুপক্ষিজনিত প্রাপ্ত দুঃখকে বলা হয় আধিভৌতিক দুঃখ। মোটকথা, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীব এই ত্রিবিধ দুঃখের কবলে পতিত হয়। এই যে দুঃখের কবলে পতিত হওয়া, সাংখ্যমতে একেই পুরুষের বদ্ধাবস্থা কিংবা সংসারদশা বলা হয়েছে।

এই ত্রিবিধ দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে মানুষ যুগে যুগে নানা উপায় খুঁজেছে, উদ্ভাবন করেছে। ঔষধ সেবনে রোগাদিজনিত দুঃখ থেকে সাময়িকভাবে

পরিত্রাণ পাওয়া গেলেও তা দিয়ে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। সুষুপ্তিতে যে দুঃখের নিরসন হয়, তাও আত্যন্তিক নয়। পুনর্জাগরণে পুনরায় সেই দুঃখভোগ শুরু হয়। যাগ–যজ্ঞাদি ক্রিয়া এবং দৃষ্ট ও লৌকিক কোন উপায়ই দুঃখের আত্যন্তিক বা চির নিবৃত্তি দিতে পারে না। বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায়ে এই দুঃখের চির নিবৃত্তির উপায় খোঁজা হয়েছে। সেক্ষেত্রে সাংখ্য দার্শনিকরা তত্ত্বজ্ঞানকেই মুক্তির একমাত্র পথ বলে মনে করেন। এ প্রেক্ষিতে সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায় নির্দেশ করতে দ্বিতীয় কারিকায় বলেছেন –

'...ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ'–

***অর্থাৎ**, ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ–এর বিবেকজ্ঞান থেকে দুঃখের অবশ্যম্ভাবী চিরনিবৃত্তি হয়।*

'ব্যক্ত' হলো পরিণামপ্রাপ্ত সূক্ষ্ম ও স্থূল পদার্থসমূহ, 'অব্যক্ত' হলো প্রকৃতি এবং 'জ্ঞ' হলো পুরুষ বা আত্মা। এই ত্রয়ের বিবেকজ্ঞান বা ভেদজ্ঞানই সর্ববিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির শ্রেষ্ঠ উপায়। অপরদিকে ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং জ্ঞ– এই ত্রয়ের অবিবেক বা অভেদজ্ঞানই জীবের সর্ববিধ বন্ধনজনিত দুঃখের হেতু।

সাংখ্যমতে পুরুষ স্বরূপত নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত স্বভাব। সুতরাং স্বরূপত পুরুষ বদ্ধ হয় না, আবার মুক্তও হয় না। বুদ্ধির ধর্ম যখন পুরুষে প্রতিফলিত হয়, তখন অবিদ্যাবশত পুরুষ বা আত্মা দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এক বলে মনে করে। এর ফলে মনের বৃত্তিগুলি যথা– সুখ, দুঃখ ও মোহকে বিবেকজ্ঞানহীন পুরুষ নিজের মনে করে অর্থাৎ নিজেকে কর্তা বা ভোক্তা বলে মনে করে। পুরুষ বা আত্মার এই অবস্থার নাম বন্ধনদশা। এর ফলে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সুখ–দুঃখাদি পুরুষে আরোপিত হয়। পুরুষ যখন অবিদ্যামুক্ত হয়ে চৈতন্য স্বরূপে অবস্থান করে, তখন সেই পুরুষের অবস্থাকে বলা হয় মুক্তাবস্থা।

সাংখ্যমতে তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেকজ্ঞানই মুক্তির পথ। বিবেকজ্ঞানের দ্বারা সূক্ষ্মতম ভেদ লক্ষিত হয়। ক্ষণে যে পরিণাম হয়, তাই সূক্ষ্মতম ভেদ। বিবেকজ্ঞান এই সূক্ষ্মতম ভেদের জ্ঞান। ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ বা পুরুষের বিবেকজ্ঞান এই ত্রিতত্ত্বেও স্বরূপকে প্রকাশ করে। এর ফলে পুরুষের স্ব–স্ব রূপে অবস্থান হয় এবং পুরুষ কৈবল্য বা মোক্ষ লাভ করে। পুরুষের আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠাই হলো কৈবল্য।

অপরোক্ষ বিবেকজ্ঞানের দ্বারা পরমপুরুষার্থ কৈবল্য লাভ হয় বলে এই জ্ঞান ঐকান্তিক জ্ঞান। আবার সকল দুঃখের নিবর্তক বলে এই জ্ঞান আত্যন্তিক। যমনিয়মাদি সাধ্য বলে এই জ্ঞান শুদ্ধ এবং এর দ্বারা লব্ধ মুক্তি অবিনাশী বলে এই জ্ঞান অক্ষয়। প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হলে বুদ্ধিধর্ম পুরুষ থেকে অপসৃত হয়। এ অবস্থায় পুরুষের সুখ, দুঃখ ও মোহ কিছুই অনুভূত হয় না। আত্মার এই শুদ্ধাবস্থাই সাংখ্যশাস্ত্রে মোক্ষাবস্থা বা কৈবল্যাবস্থা বলে পরিচিত।

তবে সাংখ্যমতে জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি নামে দ্বিবিধ মুক্তিই স্বীকৃত। দেহের বর্তমানে বন্ধনের মূলোচ্ছেদ হলে জীবের যে মুক্তিলাভ হয়, তাই জীবন্মুক্তি।

জীবন্মুক্তিতে জীবের সূক্ষ্ম সংস্কার বর্তমান থেকে যায়। দেহের বিনাশে এই সংস্কারের বিনাশ হয়। সকল প্রকার সংস্কারমুক্ত পুরুষের স্বরূপে অবস্থানই বিদেহমুক্তি বা পরম কৈবল্যাবস্থা।

ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়গুলি মোক্ষ বা মুক্তিকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করলেও মুক্তির স্বরূপ সম্পর্কে তারা একমত হতে পারেননি। সাংখ্য, বৌদ্ধ ও বেদান্ত দার্শনিকরা বিশ্বাস করেন যে, মোক্ষ প্রাপ্তির পর জীবের কোন দুঃখ থাকে না। কিন্তু সাংখ্য দার্শনিকরা আরো মনে করেন যে, মোক্ষ বা মুক্তি কোনরূপ সুখ অনুভূতিরও অবস্থা নয়। কারণ সুখ ও দুঃখ আপেক্ষিক শব্দ। যেখানে দুঃখ নেই সেখানে সুখ থাকতে পারে না। সাংখ্যমতে মোক্ষের দুটি দিক। একদিকে মোক্ষ বা মুক্তি বলতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে বোঝায়। অন্যদিকে সাংখ্য দার্শনিকরা মোক্ষ বা মুক্তি সুখ–দুঃখের অতীত এক তৃতীয় অবস্থাকে মনে করেন।

এই মতে, মুক্তাবস্থায় পুরুষের দৃষ্টি স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হয়। বুদ্ধির সঙ্গে সে আর নিজেকে অভিন্ন বলে মনে করে না। এই অবস্থাকে বোঝাতে গিয়ে সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণ পঁয়ষট্টি নম্বর কারিকায় বলেন –

‘তেন নিবৃত্তপ্রসবামর্থবশাৎ সপ্তরূপবিনিবৃত্তাম্ ।প্র

কৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবদবস্থিতঃ স্বস্থঃ।।’– (সাংখ্যকারিকা–৬৫)

***অর্থাৎ** : সেই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা পুরুষ–প্রকৃতি বিবেকজ্ঞান–রূপ সিদ্ধ হওয়ায় স্ব–স্বরূপে অবস্থিত পুরুষকে তখন সপ্তভাবশূন্যা প্রকৃতি স্পর্শ বা প্রভাবিত করতে পারে না এবং দর্শকের ন্যায় পুরুষ তখন উদাসীন, অসঙ্গ ও নির্বিকার।*

বিবেকজ্ঞান যুক্তির দ্বারা বা গ্রন্থাদি দ্বারা প্রামাণ্য নয়। আত্মাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করতে হলে দীর্ঘ সাধনার প্রয়োজন। বিবেকজ্ঞান, সাধনবল ও সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞানের দ্বারা জীব এইরূপ মোক্ষাবস্থা লাভ করে।

সাংখ্যমতে জগতের অভিব্যক্তি

সাংখ্য দার্শনিকরা হলেন পরিণামবাদী। তাঁদের মতে জগৎ হলো প্রকৃতির পরিণাম। প্রকৃতি হলো জগতের উৎপত্তির প্রতি উপাদান কারণ। অর্থাৎ, জগৎ ও জগতের প্রত্যেক বস্তু ও বিষয়ের মূল কারণ প্রকৃতি। বলা হয়, সৃষ্টির পূর্বে জগৎ প্রকৃতির মধ্যে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হওয়ার ফলে জগতের অভিব্যক্তি হয়। সাংখ্যমতে একেই জগতের সৃষ্টি বলা হয়। এই সৃষ্টির পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়াও সাংখ্যশাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন হলো, পুরুষ এবং প্রকৃতির সম্বন্ধ কিভাবে সম্ভব? কারণ, সাংখ্যমতে পুরুষ হলো চেতন এবং অকর্তা। অন্যদিকে প্রকৃতি হলো অচেতন এবং কর্তা। ফলে পুরুষ এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধ ধর্ম থাকায় উভয়ের ভেদ স্পষ্ট।

এর উত্তরে বলা হয়, প্রকৃতি নিজেকে ভোগ করতে পারে না। আবার ভোক্তা না থাকলে ভোগ্য পদার্থের সার্থকতা নেই। পুরুষই ভোক্তা। এইজন্য প্রকৃতিকে

পুরুষের প্রতীক্ষায় থাকতে হয়। যদিও সে পুরুষ থেকে ভিন্ন বা বিরুদ্ধ ধর্মবিশিষ্ট, তথাপি পুরুষই তার সার্থকতা সম্পাদন করে বলে সে পুরুষের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হতে ইচ্ছুক হয়।

এখানেও প্রশ্ন আসে, সাংখ্যমতে পুরুষ যেহেতু অসঙ্গ এবং উদাসীন, সেহেতু সে প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হবে কিভাবে ?

উত্তরে সাংখ্য দার্শনিকরা বলেন, পুরুষ কৈবল্য বা মুক্তির জন্য প্রকৃতি বা প্রধানের অপেক্ষা করে। সাংখ্য দর্শনে আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক– এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই কৈবল্য বা মুক্তি বলা হয়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, পুরুষ যেহেতু নিত্যমুক্ত, সেহেতু কৈবল্যের জন্য তার পক্ষে প্রকৃতির জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন কী ?

উত্তরে বলা হয়, প্রকৃতি বা প্রধান পুরুষের ভোগ্য। অনাদিকাল হতে প্রধানের থেকে নিজের ভেদ বুঝতে না পারার জন্য আত্মা বা পুরুষ প্রকৃতি বা প্রধানের ত্রিবিধ দুঃখকে নিজের দুঃখ বলে মনে করে চলেছে। ফলে পুরুষ কৈবল্যের জন্য ভীষণভাবে আগ্রহশীল হয়।

উল্লেখ্য যে, সাংখ্যমতে প্রকৃতি পুরুষের অপেক্ষা করে এবং পুরুষ প্রকৃতির অপেক্ষা করে, যেহেতু উভয়ের মধ্যে উপকার্য–উপকারভাব সম্বন্ধ আছে। পুরুষ প্রকৃতির উপকার করে প্রকৃতির সার্থকতা সম্পাদন করে। পাশাপাশি প্রকৃতির স্বরূপস্থিত সুখ–দুঃখ ভোগ করে। প্রকৃতি তখন কৃতার্থ হয়। আবার প্রকৃতি পুরুষের উপকার করে। কিভাবে ? সুখদুঃখময়ী হয়েও সে পুরুষকে সুখের স্পর্শ অপেক্ষা অধিক দুঃখের তাপ প্রদান করে। তার ফলে পুরুষের কৈবল্যলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়। এই উপকার্য–উপকারভাবটি বোঝাবার জন্য সাংখ্যকারিকাকার একবিংশ কারিকায় পঙ্গু এবং অন্ধ ব্যক্তির অপেক্ষার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন –

‘পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ।।’– (সাংখ্যকারিকা–২১)

***অর্থাৎ** : পুরুষের মুক্তির জন্য এবং প্রধানের (তথা মূল প্রকৃতির) ভোগের জন্য পঙ্গু ও অন্ধের মতো উভয়ের (অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির) সংযোগ হয়। (পুরুষ ও প্রকৃতির) সংযোগবশত মহদাদি ব্যক্ত জগতের সৃষ্টি হয়।*

পঙ্গুর জ্ঞান আছে, ক্রিয়া নাই। অন্যদিকে অন্ধের ক্রিয়া আছে, জ্ঞান নাই। অন্ধ যদি পঙ্গুকে বহন করতে ইচ্ছুক হয় এবং পঙ্গু যদি অন্ধকে চালনা করতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে উভয়েই গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হতে পারে। অনুরূপভাবে পরস্পরের উপকারের জন্যই পুরুষ এবং প্রকৃতির সংযোগ হয়ে থাকে। এজন্যেই সাংখ্যকারিকার ছাপ্পান্ন নম্বর কারিকায় বলা হয়েছে –

‘ইত্যেষ প্রকৃতিকৃতো মহাদাদিবিশেষভূতপর্য্যন্তঃ।
প্রতিপুরুষবিমোক্ষার্থং স্বার্থে ইব পরার্থ আরম্ভঃ।।’– (সাংখ্যকারিকা–৫৬)

***অর্থাৎ** : এইভাবে মহৎ থেকে (শুরু করে) পঞ্চমহাভূত পর্য্যন্ত এই যে সৃষ্টি তা প্রত্যেক পুরুষের মুক্তির জন্য প্রকৃতি নিজের প্রয়োজনের মতই পরের (অর্থাৎ পুরুষের) প্রয়োজনে সৃষ্টি করে।*

কৈবল্যপিপাসু পুরুষের উপকারের জন্যই প্রকৃতি মহৎতত্ত্বরূপে পরিণত হয়। মহৎতত্ত্ব হলো প্রকৃতির প্রথম পরিণাম এবং জগতের যাবতীয় বস্তুর বীজ।
তবে তার আগে প্রশ্ন হলো, প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ ভোগ ও কৈবল্যের হেতু হলে মহৎ প্রভৃতি সৃষ্টির প্রতি হেতু কে?
উত্তরে বলা হয়, ভোগ ও কৈবল্য– এই দুটি হলো পুরুষার্থ। প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সংযোগ হলেই ভোগ ও কৈবল্য হয় না। প্রকৃতির পরিণামবশত বুদ্ধি বা মহৎ প্রভৃতি সৃষ্টি হলে তবেই ভোগ সম্ভব হয়। অন্তঃকরণের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত সুখ–দুঃখই ভোগ্য হয়। সুতরাং ভোগের জন্য মহৎ প্রভৃতির সৃষ্টি প্রয়োজন। আবার জ্ঞান হলো অন্তঃকরণের বৃত্তি। তত্ত্বজ্ঞান বা পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদের জ্ঞান না হলে কৈবল্য হয় না। সুতরাং কৈবল্যের জন্যও মহৎ প্রভৃতি সৃষ্টি প্রয়োজন। তাই সাংখ্যকারিকার সাঁইত্রিশ নম্বর কারিকায় বলা হয়েছে –

*‘সর্ব্বং প্রত্যুপভোগং যস্মাৎ পুরুষস্য সাধয়তি বুদ্ধিঃ।
সৈব চ বিশিনষ্টি পুনঃ প্রধানপুরুষান্তরং সূক্ষ্মম্ ।।’– (সাংখ্যকারিকা– ৩৭)*

***অর্থাৎ** : যেহেতু মহৎ বা বুদ্ধি সংসারদশায় পুরুষের সমস্ত ভোগ সাধন করে, (সেহেতু) সেই বুদ্ধিই পুনরায় মোক্ষদশায় প্রধান ও পুরুষের দুর্বিজ্ঞেয় ভেদ বিশেষভাবে প্রকাশ করে।*

অতএব স্বীকার করতে হবে যে, প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগের ফলে মহৎ প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। এর দ্বারাই পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গ সিদ্ধ হয়ে থাকে।
বস্তুত প্রকৃতি একটি ক্ষণেও স্থির থাকে না। প্রতিক্ষণেই তার নিয়ত বা নিয়মিত পরিণতি হয়ে চলেছে। প্রলয়কালেও তার পরিণামপ্রাপ্তি অব্যাহত থাকে। কিন্তু ঐ সময়ে প্রকৃতির স্বরূপভূত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণের তারতম্য হয় না বলে ঐ পরিণামের ফলে অন্য কোন তত্ত্ব প্রকাশিত হয় না। এইজন্য এই পরিণামকে বলা হয় স্বরূপপরিণাম। কিন্তু যখন সৃষ্টির সময় উপস্থিত হয়, অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ ঘটলে প্রকৃতির মধ্যে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এর ফলে রজঃ সত্ত্ব ও তমোগুণের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। রজোগুণ চঞ্চল বলে প্রথমে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং পরে সত্ত্ব ও তমোগুণের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। মোটকথা, সৃষ্টির সময় প্রকৃতির স্বরূপভূত তিনটি গুণের তারতম্য হওয়ায় যে পরিণাম হয়, তাকে বলা হয় বিরূপপরিণাম। প্রকৃতির প্রথম বিরূপপরিণাম হলো মহৎতত্ত্ব। সাংখ্যকারিকার

ঈশ্বরকৃষ্ণ দ্বাবিংশ কারিকায় প্রকৃতির পরিণাম হিসেবে সৃষ্টির যে ক্রম উল্লেখ করেছেন তা হলো –

'প্রকৃতের্মহাংস্ততোহহঙ্কারস্তস্মাদ্গণশ্চ ষোড়শকঃ।

তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি।। (সাংখ্যকারিকা–২২)

***অর্থাৎ** : প্রকৃতি থেকে মহৎ, মহৎ থেকে অহঙ্কার, অহঙ্কার থেকে (মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র– এই) ষোলটি গণ (বা বিকার) এবং ষোলটি বিকারের অন্তর্গত পঞ্চতন্মাত্র থেকে (আকাশাদি) পঞ্চমহাভূত (উৎপন্ন হয়)।*

তবে কারিকাটিতে একবাক্যে এই জগত সৃষ্টির ক্রম উল্লেখ করা হলেও সাংখ্যশাস্ত্রে এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিস্তৃত ব্যাখ্যা রয়েছে। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম যে মহৎতত্ত্ব, এই মহৎতত্ত্বেরই নামান্তর হলো মহান, বুদ্ধি ইত্যাদি। একে মহান বলা হয় কারণ সকল উৎপন্ন পদার্থের মধ্যে এই পদার্থটি মহাপরিমাণযুক্ত। বুদ্ধি বলা হয় এজন্যে যে, বুদ্ধি নিজেকে যেমন প্রকাশ করে তেমনি অন্যকেও প্রকাশ করে। সাংখ্যমতে প্রথম ব্যক্ত বুদ্ধির লক্ষণ হলো অধ্যবসায়। সাংখ্যকারিকার ত্রয়োবিংশ বা তেইশ কারিকায় বলা হয়েছে –

'অধ্যবসায়ো বুদ্ধির্ধর্ম্মো জ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্য্যম্ ।

সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং তামসমস্মাদ্বিপর্য্যস্তম্ ।।'– (সাংখ্যকারিকা–২৩)

***অর্থাৎ** : অধ্যবসায় (তথা অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি) হলো বুদ্ধি। ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও (অনিমা ইত্যাদি) ঐশ্বর্য্য বুদ্ধির সাত্ত্বিক রূপ। এই ধর্মাদির বিপরীত– অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যরূপ চারটি অসৎ গুণ বুদ্ধির তামস রূপ।*

এই কারিকা অনুযায়ী, প্রথম ব্যক্ত বুদ্ধির লক্ষণ হলো অধ্যবসায়। যদিও অধ্যবসায় বুদ্ধির ব্যাপার বা বুদ্ধির ধর্মমাত্র, বুদ্ধির স্বরূপ নয়, তবুও অধ্যবসায়রূপ ব্যাপার বা ধর্মের দ্বারা বুদ্ধির লক্ষণ চিহ্নিত হয়। বুদ্ধির বিশেষ ধর্ম হলো নিশ্চয়, বস্তুর স্বরূপ নিশ্চয় করা যায় জ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা। 'এইটি আমার কর্তব্য' এরকম নিশ্চয়ই অধ্যবসায় পদবাচ্য। প্রকৃতি যেমন ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা, প্রকৃতি থেকে প্রথম উৎপন্ন বুদ্ধি বা মহৎও ত্রিগুণাত্মক। প্রকৃতির যেমন পরিণাম হয়, বুদ্ধিরও তেমনই পরিণাম হয়।

মহৎ থেকে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। অহঙ্কার হলো প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণাম। 'আমি' ও 'আমার' এই দুটি বোধ অহঙ্কারের প্রধান লক্ষণ। সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণ চতুর্বিংশ বা চব্বিশ নম্বর কারিকায় অহঙ্কারের লক্ষণ এবং অহঙ্কার থেকে উৎপন্ন দু'প্রকার তত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন –

‘অভিমানোঽহঙ্কারস্তস্মাদদ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ।

একাদশকশ্চ গণস্তন্মাত্রপঞ্চকশ্চৈব।।’– (সাংখ্যকারিকা–২৪)

***অর্থাৎ** : অন্তঃকরণের অভিমানাত্মক বৃত্তি অহঙ্কার। অহঙ্কার থেকে দুই প্রকার সৃষ্টি হয়– একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্র।*

পঞ্চতন্মাত্র হলো– শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। আর একাদশ ইন্দ্রিয় হলো– পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয় মন। সাংখ্যকারিকার ছাব্বিশ নম্বর কারিকায় জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে–

‘বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণরসনত্বগাখ্যানি।

বাক্‌পাণিপাদপায়ুপস্থানি কর্মেন্দ্রিয়াণ্যাহুঃ।।’– (সাংখ্যকারিকা–২৬)

***অর্থাৎ**: চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্– এই পাঁচটিকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ (যোনি)- এই পাঁচটিকে কর্মেন্দ্রিয় বলে।*

মহৎ–এর মতো অহঙ্কারও ত্রিগুণাত্মক। তবে সাংখ্যশাস্ত্রে অহঙ্কারের অন্তর্গত ত্রিগুণের পৃথক পৃথক নামকরণ করা হয়েছে। এ থেকে অহঙ্কার তিনপ্রকারও বলা যায়। অহঙ্কারে সত্ত্ব গুণের প্রাধান্য ঘটলে সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রজোগুণের আধিক্য ঘটলে রাজসিক অহঙ্কার এবং তমোগুণের আধিক্য ঘটলে তামসিক অহঙ্কারের সৃষ্টি হয়। সাংখ্যমতে, অহঙ্কারের সাত্ত্বিকভাগকে বৈকারিক বা বৈকৃত, রাজসভাগকে তৈজস এবং তামসভাগকে ভূতাদি বলা হয়েছে। সাংখ্যকারিকার পঁচিশ নম্বর কারিকায় বলা হয়েছে–

‘সাত্ত্বিকঃ একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ।

ভূতাদেস্তন্মাত্রঃ স তামসস্তৈজসাদুভয়ম্ ।।’– (সাংখ্যকারিকা–২৫)

***অর্থাৎ** : বৈকৃত নামক সাত্ত্বিক অহঙ্কার থেকে সাত্ত্বিক একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। ভূতাদি নামক তামস অহঙ্কার থেকে সেই তামসিক পাঁচটি তন্মাত্র উৎপন্ন হয়। তৈজস বা রাজস অহঙ্কার থেকে ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্র উভয়েই উৎপন্ন হয়।*

মোটকথা, সাংখ্যমতে অহঙ্কার থেকে ষোলটি তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। সাত্ত্বিক অহঙ্কার থেকে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হাত, পা, পায়ু, মুখ ও উপস্থ বা জননেন্দ্রিয় এই পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও মনের আবির্ভাব হয়। আর তামসিক অহঙ্কার থেকে উদ্ভব হয় পঞ্চ তন্মাত্রের।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, অহঙ্কারের অন্তর্গত রজো গুণ যদি কোন তত্ত্ব উৎপন্ন না করে, তাহলে অহঙ্কারকে ত্রিগুণাত্মক বলা যাবে কিভাবে ?

এর উত্তর হলো, রজোগুণ না থাকলে সত্ত্বগুণের ও তমোগুণের কার্যকরতা সম্ভব নয়। কারণ সত্ত্বগুণ এবং তমোগুণ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। সুতরাং যদিও রজো গুণকে সাক্ষাৎভাবে কারণ বলা যায় না, তথাপি সত্ত্ব ও তমোগুণের ক্রিয়া উৎপাদন করে বলে রজো গুণও ঐ সকল কার্যের প্রতি কারণ হয়। অর্থাৎ উক্ত উভয়প্রকার কার্যের উৎপত্তিতে রজোগুণ হলো নিমিত্তকারণ।

একাদশ ইন্দ্রিয় মন হলো উভয়াত্মক। মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্যের যেমন সহায়ক হয়, কর্মেন্দ্রিয়ের কার্যেরও সহায়ক হয়। অর্থাৎ মনের সাহায্য না পেলে জ্ঞানেন্দ্রিয় জ্ঞান উৎপাদন করতে পারে না। আবার মনের সাহায্য না পেলে কর্মেন্দ্রিয়ও কর্মসাধনে সমর্থ হয় না। এইজন্য সাতাশ নম্বর কারিকায় মনকে উভয় ইন্দ্রিয়স্বরূপ বলা হয়েছে –

‘উভয়াত্মকমত্র মনঃ সংকল্পকমিন্দ্রিয়ঞ্চ সাধর্ম্ম্যাৎ।
গুণপরিণামবিশেষান্নানাত্বং বাহ্যভেদাশ্চ।।’– (সাংখ্যকারিকা–২৭)

***অর্থাৎ**: মন উভায়ত্মক ও সঙ্কল্পাত্মক। ইন্দ্রিয়ের সমানধর্মবশত (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের মত মনও সাত্ত্বিক অহঙ্কার থেকে উৎপন্ন বলে) মনও ইন্দ্রিয়। গুণত্রয়ের পরিণামবিশেষহেতু ইন্দ্রিয় নানা এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দাদি বাহ্য বিষয়গুলিও বহু।*

সাংখ্যকারিকায় ইন্দ্রিয়গুলি বৃত্তি বা কার্য সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে–

‘শব্দাদিষু পঞ্চানামালোচনমাত্রমিষ্যতে বৃত্তিঃ।
বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাশ্চ পঞ্চানাম্ ।।’– (সাংখ্যকারিকা–২৮)

***অর্থাৎ** : শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বিষয়ে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বৃত্তি আলোচনজ্ঞান বা নির্বিকল্পক জ্ঞান মাত্র এবং বচন, আদান (গ্রহণ), বিহরণ (গমন), উৎসর্গ (মলাদিত্যাগ) ও আনন্দ (স্ত্রীসম্ভোগরূপ সন্তোষ) পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের বৃত্তি– এটাই সাংখ্য স্বীকৃত।*

সহজকথায়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা– চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এরা যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ উপলব্ধি করে। আর পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় যথা– হাত, পা, পায়ু, মুখ ও জননেন্দ্রিয়ের বৃত্তি হলো গ্রহণ, গমন, ত্যাগ, কথন ও জনন প্রত্যক্ষ করা। সাংখ্যমতে ইন্দ্রিয় বলতে ইন্দ্রিয়ের অন্তঃস্থিত অপ্রত্যক্ষ শক্তিকে বোঝায়। প্রত্যক্ষগোচর শরীরের বহির্দেশে অবস্থিত ইন্দ্রিয়গুলি বোঝায় না।

ইন্দ্রিয়গুলি শরীর নয়, শরীরাশ্রিত। বুদ্ধি বা জ্ঞানের সাধন ইন্দ্রিয়কে বুদ্ধিন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয় বলা হয়। কর্মের সাধন ইন্দ্রিয়কে বলা হয় কর্মেন্দ্রিয়। বাচস্পতি মিশ্রের মতে জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয় উভয়ই ইন্দ্রিয়ের বা আত্মার চিহ্ন হওয়ায় ইন্দ্রিয় পদবাচ্য হয়। তবে ন্যায়–বৈশেষিক দার্শনিকরা কর্মেন্দ্রিয় স্বীকার করেন না। কারণ,

তাদের মতে যা জ্ঞানের করণ তাই ইন্দ্রিয়। তাই সাংখ্যমে ইন্দ্রিয় একাদশটি হলেও ন্যায়–বৈশেষিক মতে ইন্দ্রিয় সংখ্য ছয়টি।
সাংখ্যমতে তামস অহঙ্কার থেকে পঞ্চ তন্মাত্রের আবির্ভাব হয়। এই পঞ্চ তন্মাত্র পাঁচ রকমের অনুভূতি যথা– শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, –এর সূক্ষ্ম উপাদান। তন্মাত্রগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, তাই তাদের প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু তাদের অস্তিত্বকে অনুমান করা যায়। পঞ্চ তন্মাত্র থেকে পঞ্চ মহাভূত যথা– ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম বা আকাশের সৃষ্টি। সাংখ্যকারিকার আটত্রিশ নম্বর কারিকায় বলা হয়েছে–

'তন্মাত্রাণ্যবিশেষাস্তেভ্যো ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ।

এতে স্মৃতা বিশেষাঃ শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ।।'– (সাংখ্যকারিকা–৩৮)

***অর্থাৎ** : (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ– এই পাঁচটি) তন্মাত্রকে অবিশেষ (বা সূক্ষ্ম ভূত) বলে। সেই পাঁচটি (তন্মাত্র) থেকে (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম– এই) পাঁচটি স্থূলভূত উৎপন্ন হয়। এই পাঁচটি স্থূলভূত (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণাত্মক বলে এদের) সুখ, দুঃখ ও মোহ–স্বভাব বলা হয়।*

পঞ্চতন্মাত্র থেকে যে পঞ্চমহাভূতের সৃষ্টি হয়, সাংখ্য দর্শনে এই কারিকাটির একাধিক ব্যাখ্যা দেখা যায়। প্রচলিত ব্যাখ্যানুযায়ী সাংখ্য দার্শনিকরা বলেন, শব্দতন্মাত্র থেকে ব্যোম বা আকাশ, শব্দতন্মাত্র ও স্পর্শতন্মাত্র থেকে মরুৎ বা বায়ু, শব্দস্পর্শরূপ তন্মাত্র থেকে তেজ, শব্দস্পর্শরূপরস তন্মাত্র থেকে অপ্ বা জল এবং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ তন্মাত্র থেকে ক্ষিতি বা পৃথিবী উৎপন্ন হয়।
এ প্রেক্ষিতে কোন কোন সাংখ্যদার্শনিক যেমন যুক্তিদীপিকাকার বলেছেন যে, এক একটি তন্মাত্র থেকে এক একটি স্থূলভূত উৎপন্ন হয়। আকাশ যেমন শব্দতন্মাত্র থেকে উৎপন্ন হয়, তেমনি বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী উৎপন্ন হয় যথাক্রমে স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র থেকে। এক্ষেত্রে বায়ু প্রভৃতির সৃষ্টিতে অন্য তন্মাত্রের অনুপ্রবেশ হয় না। ফলে কার্যকারণভাব সুসঙ্গত হয়।
কিন্তু সাংখ্যদর্শনের অন্যান্য আচার্য্যদের মতে, বস্তুস্থিতির উপপাদনের জন্য হেতুরূপে অন্য তন্মাত্রের অনুপ্রবেশ স্বীকার করা প্রয়োজন। কারণ উপাদানকারণের গুণ কার্যে উপলব্ধি হয়। তাই উপাদানসংশ্লিষ্ট তন্মাত্রের কারণেই আকাশে শব্দ, বায়ুতে শব্দ স্পর্শ, তেজে শব্দ স্পর্শ রূপ, জলে শব্দ স্পর্শ রূপ রস এবং পৃথিবীতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই গুণগুলির উপলব্ধি হয়।
সাংখ্য দার্শনিকরা স্থূল মহাভূতের একাধিক গুণ আছে বলে স্বীকার করলেও ন্যায়মতে প্রত্যেকটি মহাভূতের জন্য একটি করে গুণ স্বীকার করা হয়।
সাংখ্যমতে স্থূল ভূতগুলি শান্ত ঘোর এবং মূঢ় হওয়ার জন্যই বিশেষত্ব বিশিষ্ট হয়। অর্থাৎ আকাশ প্রভৃতি স্থূল ভূতগুলি উক্ত তিনপ্রকার হলেও সকলের কাছে সমভাবে প্রতীত হয় না। কতকগুলি সত্ত্বগুণপ্রধান, কতকগুলি রজোগুণপ্রধান এবং কতকগুলি তমোগুণপ্রধান। শান্তভূতগুলি সুখ, প্রকাশ এবং লঘু। এগুলি

সুখময় হওয়ায় সন্নিকৃষ্ট পুরুষকে সুখী করে। প্রকাশময় হওয়ায় পুরুষের নিকট স্বচ্ছভাবে নিজেকে উপস্থাপিত করে। আবার লঘু হওয়ায় দ্রুতগতি উর্ধ্বগতি প্রভৃতির আশ্রয় হয়ে থাকে। এইভাবে শান্তত্ববিশিষ্ট ভূতগুলি উপভোগ্য হয়।কিন্তু ঘোর ভূতগুলি দুঃখময় ও অনবস্থিত। রজোগুণ পরিস্ফুট হওয়ায় সে সন্নিকৃষ্ট পুরুষকে দুঃখী করে এবং অনবস্থিত, চঞ্চল বা ক্রিয়াশীল হয়। এইভাবে ঘোরত্ববিশিষ্ট গুণগুলি উপভোগ্য হয়।

আবার মূঢ় ভূতগুলি বিষণ্নও গুরু। বিষাদময় হওয়ায় সন্নিকৃষ্ট পুরুষকে মুগ্ধ করে এবং গুরু হওয়ায় সত্ত্ব ও রজোগুণের সতত কার্যকারিতায় প্রতিবন্ধক হয়। এইভাবে ভূতগুলি পরস্পর ভিন্ন হয়ে প্রতীয়মান হয়। বলাবাহুল্য যে এইরূপ উপভোগযোগ্যতারূপ বিশেষ না থাকায় তন্মাত্রগুলিকে অবিশেষ এবং সূক্ষ্ম বলা হয়।

সাংখ্যমতে সৃষ্টিকে সর্গ বলা হয়েছে। সর্গ দু'প্রকার যথা– প্রত্যয়সর্গ বা বুদ্ধি সর্গ এবং তন্মাত্র সর্গ বা ভৌতিক সর্গ। প্রত্যয় সর্গ বা বুদ্ধি সর্গের আওতাভুক্ত হলো মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও উভয়েন্দ্রিয় মন এই তেরোটি পরিণাম। আর তন্মাত্র সর্গ বা ভৌতিক সর্গের আওতায় পড়ে পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ মহাভূত এবং মহাভূত হতে উৎপন্ন সকল দ্রব্য। পঞ্চতন্মাত্র অতীন্দ্রিয় বলে তা 'অবিশেষ' নামে পরিচিত। অন্যদিকে পঞ্চমহাভূত ও তাদের দ্বারা সৃষ্ট দ্রব্যগুলিকে 'বিশেষ' বলা হয়। সাংখ্যকারিকায় বলা হয়েছে–

'সূক্ষ্মা মাতাপিতৃজাঃ সহ প্রভূতৈস্ত্রিধা বিশেষাঃ স্যুঃ।
সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা মাতাপিতৃজা নিবর্ত্তন্তে।।'– (সাংখ্যকারিকা–৩৯)

***অর্থাৎ** : বিশেষ তিন প্রকার (যথা-) সূক্ষ্মশরীর, মাতা–পিতা থেকে জাত স্থূলশরীর ও পাঁচটি মহাভূত। এদের মধ্যে সূক্ষ্মশরীর প্রলয়কাল পর্যন্ত (আপেক্ষিক) নিত্য, স্থূলশরীর (কিছুদিন থেকে) নষ্ট হয়।*

সাংখ্যমতে সৃষ্টি বলতে প্রলয়ের পর প্রথম সৃষ্টি বোঝানো হয়। সৃষ্টির পরে প্রলয় হয় এবং প্রলয়ের পর সৃষ্টি হয়। এইভাবে এই প্রবাহ অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। প্রলয়ের পর যখন সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন সূক্ষ্মশরীর নির্মিত হয়। তখন হতে আরম্ভ করে মহাপ্রলয় পর্যন্ত এই সূক্ষ্মশরীর বর্তমান থাকে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই যেহেতু নিত্য সেহেতু প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগও নিত্য। ফলে সর্বদা কেবল সৃষ্টি হওয়ায়, প্রলয়ব্যবস্থার উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী।

উত্তরে সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণ উনষাট নম্বর কারিকায় বলেছেন–

'রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য বিনিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ।।'– (সাংখ্যকারিকা–৫৯)

***অর্থাৎ** : নর্তকী যেমন দর্শকগণকে নৃত্য দেখিয়ে নৃত্য থেকে নিবৃত্ত হয়, প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষের সামনে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে (সৃষ্টি ব্যাপার থেকে) নিবৃত্ত হয়।*

সুতরাং, সাংখ্যাচার্যের মতে, সৃষ্টির ন্যায় প্রলয়ও সম্ভব। আর জগৎকার্যরূপ সৃষ্টির কারণও সাংখ্যকারিকার আটান্ন নম্বর কারিকায় দৃষ্টান্ত দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে–

'ঔৎসুক্যনিবৃত্ত্যর্থং যথা ক্রিয়াসু প্রবর্ত্ততে লোকঃ।

পুরুষস্য বিমোক্ষার্থং প্রবর্ত্ততে তদ্বদব্যক্তম্ ।।'– (সাংখ্যকারিকা–৫৮)

***অর্থাৎ** : লোকে যেমন কৌতুহল বা আগ্রহ নিবৃত্তির জন্য কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তেমনি প্রকৃতিও পুরুষের মোক্ষের জন্য কার্যে প্রবৃত্ত হয়।*

এই কার্যই হলো সৃষ্টি। বস্তুত সাংখ্যদর্শনের অভিব্যক্তিবাদ সৎকার্যবাদেও উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তাই এই মতে উৎপত্তি নতুন কোন সৃষ্টি নয়, কেবল অব্যক্তের ব্যক্ত হওয়া। আবার বিনাশ কখনোই পরিপূর্ণ বিনাশ নয়, কেবল ব্যক্তের অব্যক্তে বিলীন হওয়া।

সাংখ্যমতে প্রকৃতির জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। পুরুষের ভোগ এবং পুরুষের মুক্তি। যদিও পুরুষ স্বরূপত ভোক্তা নয়, তবুও বুদ্ধি বা মহৎ স্বগত সুখ এবং দুঃখরূপ ভোগকে পুরুষে প্রতিবিম্বিত করে। এইভাবে পুরুষে ভোক্তৃত্ব উৎপন্ন হয়। আবার পুরুষ এবং প্রকৃতির ভেদজ্ঞান বা বিবেকখ্যাতি উৎপন্ন কওে প্রকৃতি পুরুষের মুক্তিসাধন করে। অর্থাৎ প্রকৃতির সৃষ্টির ফলে পুরুষ ভোগ কওে এবং পুরুষের ভোগের ফলে পুরুষের মুক্তি বা কৈবল্য সম্ভব হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রকৃতির সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে উদ্দেশ্যমূলক বলা যায়। এই অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। অপরিণামী পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির চব্বিশটি তত্ত্বেও সাহায্যে সাংখ্য দার্শনিকরা এভাবেই জগতের অভিব্যক্তি বর্ণনা করেছেন।

সাংখ্য জ্ঞানতত্ত্ব

সাংখ্য দর্শনে মোক্ষ–উপযোগী বিবেকজ্ঞান ছাড়াও একপ্রকার ব্যবহারিক জ্ঞান স্বীকার করা হয়েছে। ঘট–পট ইত্যাদি জাগতিক বিষয়ক যে জ্ঞানের দ্বারা আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়, তাকেই ব্যবহারিক জ্ঞান বলা হয়। ন্যায়–বৈশেষিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাংখ্য সম্প্রদায়ও এ বিষয়ে একমত যে, জ্ঞান মাত্রই সবিষয়ক। বিষয় বিহীন কোন জ্ঞানের অস্তিত্ব নেই। জ্ঞানের বিষয়কে বলা হয় জ্ঞেয় এবং জ্ঞানের কর্তাকে বলা হয় জ্ঞাতা। সাংখ্যমতে পুরুষই একমাত্র জ্ঞাতা হতে পারে। পুরুষ বা আত্মার বহুত্ব সাংখ্যশাস্ত্রে স্বীকৃত। পুরুষ ব্যতীত বাকি সকল তত্ত্বই অচেতন বলে প্রকৃতিজাত মহৎ ইত্যাদি যাবতীয় বস্তুই অচেতন ও কেবলমাত্র জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয় হতে পারে।

সাংখ্যমতে একটি জ্ঞেয়বস্তু একাধিক জ্ঞাতার দ্বারা জ্ঞাত হতে পারে। তবে একই বিষয়ের জ্ঞান যে সকলের একই রূপ হবে এমন কোন কথা নেই। একই বিষয় হতে বিভিন্ন জ্ঞাতার বিভিন্নরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে। যেমন বলা যেতে পারে যে, সুন্দরী রমণীকে দেখে স্বামীর সুখ, সপত্নীর দুঃখ, কামুকের মোহ এবং উদাসীনের ঔদাসীন্য দেখা যায়। আবার কোন বস্তু যদি কখনো কারোর জ্ঞানের বিষয় না হয়, তাহলেও তা অস্তিত্বশীল হতে পারে। এ প্রেক্ষিতে সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণ সপ্তম কারিকায় বলেন–

'অতিদূরাৎসামীপ্যাৎ ইন্দ্রিয়ঘাতাৎ মনোহনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাৎ ব্যবধানাৎ অভিভবাৎ সমানাভিহারাৎ চ।।'– (সাংখ্যকারিকা–৭)

***অর্থাৎ** : অতি দূরে অথবা অতি নিকটে থাকায়, ইন্দ্রিয় আহত হওয়ায়, মনোযোগের অভাবে, সূক্ষ্মতার জন্য, ব্যবধান বা আড়াল থাকায়, (উচ্চ শক্তি দ্বারা নিম্নশক্তি) অভিভূত হওয়ায় এবং সমান বস্তুতে মিশে যাওয়ায় সৎ বস্তুর অনুপলব্ধি হয় (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বাধা প্রাপ্ত হয়)।*

এ কারণে, সাংখ্যমতে, কোন জ্ঞাতার উপলব্ধিতে না এলেই বিষয়কে অনস্তিত্বশীল বলা যায় না। এজন্য বিষয়কে স্বতন্ত্র বলা হয়।

সাংখ্যমতে পরিণামী প্রকৃতির প্রথম উৎপন্ন তত্ত্ব হলো মহৎ বা বুদ্ধি। প্রকৃতিজাত বুদ্ধিও প্রকৃতির ন্যায় পরিণামী ও গতিশীল। বিষয়ের সংস্পর্শে বুদ্ধির বৃত্তি হয়। ইন্দ্রিয়ার্থ–সম্বন্ধাদিকে দ্বার করে বুদ্ধিবৃত্তি বহির্গমন করে এবং ঘট–পট ইত্যাদি বিষয়াকার ধারণ করে। অর্থাৎ, যখন বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ পায় এবং ইন্দ্রিয়ের সাথে মনের সংযোগ হয় তখন বুদ্ধি বিষয়াকারে পরিণত হয়। বুদ্ধি দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ, নির্মল ও সংকোচ–বিকাশ স্বভাব। ফলে বিষয়টি যে আকার বা প্রকারের হয়, বুদ্ধি বা চিত্ত সেই আকার বা প্রকার গ্রহণ করে। বুদ্ধির এইরূপ বিষয়াকার গ্রহণকে বলা হয় বুদ্ধিবৃত্তি।

বিষয়াকারে আকারপ্রাপ্ত বুদ্ধিবৃত্তিতে যখন পুরুষ প্রতিবিম্বিত হয়, তখন আমাদের ঐ বিষয়ের জ্ঞান বা উপলব্ধি হয়। সাংখ্যমতে বুদ্ধিবৃত্তি ও বিষয় উভয়ই জড় পদার্থ হওয়ায় চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের প্রতিবিম্বন ব্যতীত পুরুষ বা আত্মার বোধরূপ উপলব্ধি সম্ভব নয়। এই কারণে বুদ্ধিবৃত্তিকে জ্ঞানের করণ এবং পুরুষের উদ্ভাসিত বুদ্ধিবৃত্তিকে জ্ঞান বলা হয়।

সাংখ্যকারিকার টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র মনে করেন, কেবল বুদ্ধিতে পুরুষের প্রতিবিম্বনের ফলেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে, জ্ঞানোৎপত্তির জন্য বুদ্ধিতে যেমন পুরুষের প্রতিবিম্বন প্রয়োজন, তেমনি পুরুষের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবিম্বন প্রয়োজন। বিজ্ঞানভিক্ষুর এই মতবাদ '**অন্যোন্যপ্রতিবিম্ববাদ**' নামে পরিচিত।

প্রমাণ (Source of Knowledge)

যার দ্বারা যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায় তাকে 'প্রমাণ' বলা হয়। আর যথার্থ জ্ঞান বা উপলব্ধি হলো প্রমা। সাংখ্যমতে বুদ্ধিবৃত্তিকে জ্ঞানের করণ বা প্রমাণ এবং পুরুষের উদ্ভাসিত বুদ্ধিবৃত্তিকে জ্ঞান বা প্রমা বলা হয়। এই মতে চৈতন্যের দ্বারা উদ্ভাসিত বুদ্ধিবৃদ্ধিমাত্রই প্রমাপদবাচ্য নয়। অসন্দিগ্ধ, অবিপরীত ও অনধিগত বিষয়ক চিত্তবৃত্তিই প্রমাণ এবং তার উদ্ভাসিত ফল হলো প্রমা। এ বিষয়ে বাচস্পতি মিশ্র তাঁর কৌমুদীতে বলেন–

'অসন্দিগ্ধারিপরীতানধিগতবিষয়া চিত্তবৃত্তিঃ।

বোধশ্চ পৌরুষেয়ঃ ফলং প্রমা, তৎ সাধনং প্রমাণমিতি।'– (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী : কারিকা–৪)

***অর্থাৎ** : অসন্দিগ্ধ, অবিপরীত, অনধিগত বিষয়ের আকারে আকারিত চিত্তবৃত্তিকে প্রমাণ বলে। প্রমাণের পুরুষনিষ্ঠ বোধরূপ ফলই প্রমা। তার (প্রমার) সাধনই প্রমাণ।*

সংশয়, ভ্রম বা জ্ঞাতবিষয়ের জ্ঞান সাংখ্যমতে প্রমাপদবাচ্য নয়। সংশয় হলো সন্দিগ্ধ জ্ঞান, ভ্রম হচ্ছে বিষয়–বিপরীত জ্ঞান এবং স্মৃতি হলো অধিগত বিষয়ের জ্ঞান। সংশয়, ভ্রম বা স্মৃতি যাতে প্রমাপদবাচ্য না হয়, সে কারণে অসন্দিগ্ধ, অবিপরীত ও অনধিগত বিষয়ক চিত্তবৃত্তিজন্য জ্ঞানকে প্রমা বলা হয়েছে। সাংখ্যমতে প্রমাণ ত্রিবিধ– প্রত্যক্ষণ (Perception), অনুমান (Inference) ও শব্দ বা আগম (Testimony)।

সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণ চতুর্থ সাংখ্যকারিকায় বলেন–

'দৃষ্টমনুমানমাপ্তবচনঞ্চ সর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ।

ত্রিবিধং প্রমাণম্ ইষ্টং প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি।।'– (সাংখ্যকারিকা–৪)

***অর্থাৎ** : (উপমান, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি ইত্যাদি) সকল প্রকার প্রমাণ দৃষ্ট, অনুমান ও আপ্তবচনের দ্বারা সিদ্ধ হওয়ায় সাংখ্যশাস্ত্রে কেবলমাত্র এই তিনপ্রকার প্রমাণ অভিলষিত, যেহেতু প্রমাণের দ্বারাই প্রমেয় সিদ্ধি হয়।*

পঞ্চম কারিকায় সাংখ্যকারিকাকার আবার এই ত্রিবিধ প্রমাণ তথা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবাক্য বা শব্দ প্রমাণকে সংজ্ঞায়িত করেছেন–

'প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টং ত্রিবিধম্ অনুমানম্ আখ্যাতম্ ।

তল্লিঙ্গলিঙ্গিপূর্ব্বকম্ আপ্তশ্রুতিঃ আপ্তবচনম্ তু।।'– (সাংখ্যকারিকা–৫)

***অর্থাৎ** : বিষয়ের সঙ্গে সন্নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞান দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। লিঙ্গ ও লিঙ্গী পূর্বক অনুমান তিন প্রকার (যথা– পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট) বলা হয়। কিন্তু, (বেদবাক্য বা) ঋষিবাক্যই আপ্তবচন বা শব্দ প্রমাণ।*

প্রত্যক্ষ প্রমাণ (Perception)

প্রত্যক্ষকে প্রমাণ–জ্যেষ্ঠ বলা হয়, এবং তা অন্যান্য প্রমাণের উপজীব্য বলে প্রত্যক্ষণই প্রমাণগুলির মধ্যে প্রথম প্রমাণ। বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে যে সাক্ষাৎ জ্ঞানের উদ্ভব হয়, তাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা হয়। সাংখ্যকারিকাকার তাই পঞ্চম কারিকার সংশ্লিষ্ট অংশে বলেন–

'প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টম্'–

***অর্থাৎ**, বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজনিত যে অধ্যবসায়, তাই প্রত্যক্ষজ্ঞান।*

সাংখ্যমতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন হলো জ্ঞানের করণ। তার মধ্যে পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন– এই ত্রিবিধ অন্তঃকরণ জ্ঞানসামান্যের কারণ। একমাত্র পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিশেষ কারণ। মন অন্তঃপ্রত্যক্ষেও বিশেষ কারণ এবং তা সাংখ্যমতে ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে স্ব স্ব বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলে তমোগুণের অভিভবপূর্বক সত্ত্বগুণের যে পরিণাম হয়, তাই প্রত্যক্ষরূপ অধ্যবসায়।

প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে কেবল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই বুদ্ধি বা চিত্ত বিষয়াকার গ্রহণ করে, কিন্তু অনুমিতি ও শাব্দবোধের ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পদজ্ঞানের প্রয়োজন হয়। তবে বাচস্পতি মিশ্রেও মতে ইন্দ্রিয়কে প্রত্যক্ষেও করণ বলা যায় না। তাঁর মতে, ইন্দ্রিয়গুলি কোন কোন সময় যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন করলেও সব সময় তা করে না। তাই ইন্দ্রিয়গুলিকে করণ বলা যায় না। এই মতে বুদ্ধিবৃত্তিই প্রমাণ এবং ইন্দ্রিয়গুলি বুদ্ধিবৃত্তিরূপ প্রমাণের দ্বারস্বরূপ। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে তিনি প্রত্যক্ষের উৎপত্তিক্রম ব্যাখ্যা করেছেন।

একটি বস্তু বা ঘট যখন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গোচর হয়, তখন বস্তুটি আমাদেও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের মধ্যে এক প্রকার ঘটাকার আলোড়ন সৃষ্টি করে। এর ফলে অন্তরিন্দ্রিয় মনে সেই আলোড়ন বা সংবেদনের ব্যাখ্যারূপ একপ্রকার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মন তখন ঐ ঘটাকারটিকে অহঙ্কারের নিকট প্রেরণ করে। অহঙ্কার সেই আকারে আকারিত হয়ে বুদ্ধিতে উপস্থিত হয়। বুদ্ধি যখন এই ঘটাকারে আকারিত হয়, তখন তাকে বলে ঘটাকার বুদ্ধিবৃত্তি। ঘটাকারে আকারিত এই বুদ্ধিবৃত্তি প্রকৃতিগতভাবে সত্ত্বগুণান্বিত এবং দর্পণের ন্যায় অতি স্বচ্ছ। এই স্বচ্ছ বুদ্ধিবৃত্তিতে যখন পুরুষের চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হয়, এর ফলে বুদ্ধিবৃত্তি চেতনাভাবাপন্ন হয় এবং তখনই ঘটটি প্রকাশিত হয়। ঘটটির এইরূপ যথাযথ প্রকাশকেই বলে ঘটের প্রত্যক্ষ প্রমা। যে

বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা এইরূপ প্রকাশ হয়, তাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রমাণ হলো বুদ্ধির অচেতন বৃত্তি এবং প্রমা ঐ বৃত্তিরই প্রকাশিত চেতন রূপ। যদিও বিজ্ঞানভিক্ষু এই মতের অন্যরকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, জ্ঞান বুদ্ধিতে সম্ভব নয়, একমাত্র পুরুষেই জ্ঞান সম্ভব।

সাংখ্যমতে ইন্দ্রিয়াদি করণবৃত্তি কখনো যুগপৎ, আবার কখনো ক্রমশ হয়ে থাকে। ক্রমশ বৃত্তির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বৃত্তিকে আলোচন এবং পরবর্তী মনের বৃত্তিকে সংকল্প বলা হয়। বাচস্পতি মিশ্র ও বিজ্ঞানভিক্ষু **আলোচন** ও **সংকল্প** বৃত্তিকে যথাক্রমে **নির্বিকল্পক** ও **সবিকল্পক** প্রত্যক্ষ সদৃশ বলে বর্ণনা করেছেন।

ন্যায়–বৈশেষিক মতে, যে প্রত্যক্ষণে বস্তুর কেবল অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান হয়, তাকে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষণ বলে। এই নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষণে বস্তুর কোন বৈশিষ্ট্যকে জানা যায় না। অর্থাৎ বস্তুটি কী রকমের, এর জাতি বা নাম কী, সংজ্ঞা কী ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায় না। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

অন্যদিকে, যে প্রত্যক্ষণে বস্তুর নাম, লক্ষণ, জাতি প্রভৃতি যাবতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট জ্ঞান লাভ হয়, তা সবিকল্পক প্রত্যক্ষণ। সবিকল্পক প্রত্যক্ষণে বিশ্লেষণ, সাদৃশ্য, তুলনা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াকে প্রয়োগ করে বস্তু সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ হয়। সবিকল্পক প্রত্যক্ষকে ভাষায় প্রকাশ করা যায়। সাংখ্য দর্শনে সবিকল্প প্রত্যক্ষণকে '**বিবেচনা**'ও বলা হয়।

অনুমান প্রমাণ (Inference)

অনুমান হলো ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পক্ষধর্মতা জ্ঞানজন্য বুদ্ধিবৃত্তি। দুটি বস্তুর মধ্যে যদি নিয়ত সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি সম্বন্ধ দেখা যায়, তবে একটিকে প্রত্যক্ষ করে অন্যটির অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়, এই জ্ঞানকে অনুমানলব্ধ জ্ঞান বলা যায়। যেমন, একটি পর্বতে ধোঁয়া বা ধূম প্রত্যক্ষ করে ধারণা করা হয় যে, সেখানে আগুন রয়েছে। যেখানে ধোঁয়া সেখানে আগুন, ধোঁয়া এবং আগুনের মধ্যে নিয়ত সম্বন্ধ আছে বলে ধোঁয়া প্রত্যক্ষ করে আগুনের অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা হয়। সাংখ্যকারিকার পঞ্চম কারিকায় সংশ্লিষ্ট অংশে অনুমানের সামান্য লক্ষণে বলা হয়েছে–

*'তল্লিঙ্গলিঙ্গিপূর্ব্বকম্'–**অর্থাৎ**, লিঙ্গ ও লিঙ্গি পূর্বক অনুমান।*

'লিঙ্গ' শব্দের অর্থ ব্যাপ্য বা হেতু। 'লিঙ্গি' শব্দের অর্থ ব্যাপক বা সাধ্য। ধূম বহ্নির লিঙ্গ এবং বহ্নি ধূমের লিঙ্গি। এইরূপ লিঙ্গ–লিঙ্গি বা ব্যাপ্য–ব্যাপক সম্বন্ধের পারিভাষিক নাম ব্যাপ্তি। ব্যাপ্তি স্বাভাবিক সম্বন্ধ। অর্থাৎ ব্যাপ্তি সম্বন্ধ উপাধিরহিত বা অনৌপাধিক। যাদের মধ্যে শর্ত বা উপাধি থাকে, তাদেও সম্বন্ধকে স্বাভাবিক বলা যায় না। ধূমের সঙ্গে বহ্নি বা আগুনের সম্বন্ধ উপাধিশূন্য, মানে এখানে কোন শর্ত নেই। ধূম থাকলে সেখানে আগুন থাকবেই। কিন্তু বহ্নির সঙ্গে ধূমের সম্বন্ধ আর্দ্র–ইন্ধন উপাধিযুক্ত। মানে, আগুন থাকলেই সেখানে ধূম থাকবে না, যদি না কোন

ভেজা জ্বালানি থাকে। অগ্নিতপ্ত গলন্ত লোহার আগুনে কোন ধূম থাকে না, ভেজা জ্বালানি না থাকায়। অর্থাৎ যে অগ্নি সেখানে ধূম থাকবে যদি সেখানে ভেজা জ্বালানি থাকার শর্ত বা উপাধি যুক্ত হয়। তাই ধূম ও বহ্নির মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ থাকে। কিন্তু বহ্নি ও ধূমের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ থাকে না। এই কারণে ধূম থেকে আগুনের অনুমান হয়, কিন্তু আগুন থেকে ধূমের অনুমান হয় না।

ন্যায়মতের অনুরূপ সাংখ্যমতেও অনুমান ত্রিবিধ– **পূর্ববৎ**, **শেষবৎ** ও **সামান্যতোদৃষ্ট**।

অনুমানের ব্যাপ্তি যখন কার্য–কারণ সম্বন্ধের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আমরা যেমন কারণ থেকে কার্যকে অনুমান করতে পারি, তেমনি কার্য থেকে কারণকেও অনুমান করতে পারি। প্রথম প্রকার অনুমানকে বলা হয় পূর্ববৎ এবং দ্বিতীয় প্রকার অনুমানকে বলা হয় শেষবৎ। প্রচণ্ড খরা দেখে ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষেও অনুমান হলো পূর্ববৎ অনুমানের দৃষ্টান্ত। আবার নদীর জলের মলিনতা ও খরস্রোত দেখে অতীত বৃষ্টির অনুমান হলো শেষবৎ অনুমানের দৃষ্টান্ত।

যে অনুমানের ব্যাপ্তি কার্য–কারণ সম্বন্ধের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয় না, বা যে অনুমানের হেতু ও সাধ্য কার্য–কারণ সম্বন্ধে সংবদ্ধ নয়, কেবল সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে অনুমানটি গড়ে ওঠে, সেই অনুমানকে বলা হয় সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। বিভিন্ন সময়ে গ্রহাদির অবস্থান বিভিন্ন স্থানে বা দেশে পর্যবেক্ষণ করে আমরা যখন গ্রহাদিও গতির অনুমান করি, তখন সেই অনুমানকে বলা হয় সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। একটি বস্তুর বিভিন্ন স্থানে অবস্থানের সঙ্গে ঐ বস্তুর গতির কোন কার্য–কারণ সম্বন্ধ নেই। কিন্তু দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় আমরা গতিশীল বস্তুকে বিভিন্ন স্থানে দেখে থাকি এবং এই অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরা গ্রহাদিও বিভিন্ন স্থানে অবস্থান দেখে অনুমান করি যে গ্রহাদি গতিশীল। এটাই সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান।

পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট– এই ত্রিবিধ অনুমানকে সাংখ্যাচার্যরা আবার **বীত** ও **অবীত** ভেদে দুইভাগে ভাগ করেছেন।

যে অনুমান হেতু ও সাধ্যেও অন্বয় সাহচর্যের ভিত্তিতে ভাবরূপে সাধ্যের সাধন করে, অর্থাৎ সদর্থক সামান্য বাক্যকে অবলম্বন করে যে অনুমান গড়ে ওঠে তাকে 'বীত' অনুমান বলা হয়।

অপরদিকে নঞর্থক সামান্য বাক্যকে অনুমান করে যে অনুমান গড়ে ওঠে, অর্থাৎ যে অনুমান হেতু ও সাধ্যের ব্যতিরেক সাহচর্যেও ভিত্তিতে সাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু কারোর বিধায়ক না হয়ে প্রতিষেধক হয় তাকে 'অবীত' অনুমান বলে।

পূর্ববৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান হলো বীত অনুমান। অন্যদিকে শেষবৎ অনুমান হলো অবীত অনুমান।

শব্দ বা আগম প্রমাণ (Testimony)

সাংখ্যসম্মত তৃতীয় প্রকার প্রমাণ হলো শব্দ, আগম বা আপ্তবাক্য। যে সমস্ত বিষয় বা বস্তুকে প্রত্যক্ষ বা অনুমানের সাহায্যে জানা যায় না, তাদেরকে শব্দ প্রমাণের

সাহায্যে জানা যায়। এ প্রেক্ষিতে সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণ ষষ্ঠ কারিকায় বলেন–

'সামান্যতস্তু দৃষ্টাৎ অতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ।
তস্মাদপি চ অসিদ্ধং পরোক্ষম্ আপ্তাগমাৎ সিদ্ধম্ ।।'– (সাংখ্যকারিকা–৬)

***অর্থাৎ** : সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের দ্বারা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের অতীত (প্রকৃতি, পুরুষাদি) তত্ত্বের জ্ঞান হয়। সামান্যতোদৃষ্ট এবং শেষবৎ অনুমানের দ্বারা অতীন্দ্রিয় কোন তত্ত্ব অসিদ্ধ হলে সেই অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব আপ্তবচনরূপ আগম বা শব্দ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়।*

যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে হলে শব্দ বা আপ্তবাক্যেল অর্থ সঠিকভাবে বুঝতে হবে। আপ্তবাক্য হলো বিশ্বস্ত ব্যক্তির উপদেশ। যে ব্যক্তি ভ্রম–বিপ্রলিপ্সাদি দোষমুক্ত, তিনিই আপ্ত। এইরূপ আপ্তব্যক্তির উপদেশ হলো শব্দ প্রমাণ। বলাই বাহুল্য যে, উপদেশজন্য জ্ঞানের পক্ষে একদিকে বাক্যের পদজ্ঞান এবং অপরদিকে আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, সন্নিধি ও তাৎপর্য, বাক্যান্তর্গত এই চার প্রকার সম্বন্ধের জ্ঞান প্রয়োজন। সুতরাং যে বুদ্ধিবৃত্তি এই সকল জ্ঞানসাপেক্ষ প্রমার করণ হয়, তাই শব্দ প্রমাণ

ন্যায় সম্প্রদায়ের অনুরূপ সাংখ্যমতেও শব্দ প্রমাণ দু'প্রকার– **লৌকিক** ও **বৈদিক**। লৌকিক শব্দ হলো বিশেষজ্ঞ ও বিশ্বাসযোগ্য লোকের বচন। লৌকিক শব্দ প্রত্যক্ষণ ও অনুমানের সাহায্যেও লাভ করা যায়। সাংখ্য দার্শনিকরা লৌকিক শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলে মনে করেন না, কিন্তু বৈদিক শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ মানেন। বৈদিক শব্দ হলো বেদের বচন। বেদ, দেবতা, স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষের অতীত এবং অনুমানের অগম্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানদান করে। বৈদিক শব্দ কোন মানুষের কৃত নয়। মানুষের কৃত নয় বলে মানুষ যে জাতীয় ভুল করে সে জাতীয় ভুল বেদে থাকতে পারে না। সত্যদ্রষ্টা ঋষিদেও অভিজ্ঞতাকেই বেদে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাই বৈদিক শব্দ অভ্রান্ত ও স্বতঃপ্রমাণ।

ভারতীয় ষড়দর্শনের অন্যতম সাংখ্যদর্শন বা **সাংখ্যশাস্ত্রকে প্রাচীনতম ভারতীয় দর্শন** হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মহর্ষি কপিল হচ্ছেন এই দর্শনের সূত্রকার। তাই সাংখ্যকে কখনও কখনও কপিল–মত বা কপিল–দর্শন নামেও উল্লেখ করা হয়ে থাকে। বলা হয়ে থাকে, কপিলের শিষ্য ছিলেন আসুরি এবং আসুরির শিষ্য ছিলেন পঞ্চশিখ। কথিত আছে যে, মুনি কপিল দুঃখে জর্জরিত মানুষের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাঁর শিষ্য আসুরিকে পবিত্র ও সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান সাংখ্যশাস্ত্র প্রদান করেছিলেন। আসুরি সেই জ্ঞান পঞ্চশিখকে প্রদান করেন। এরপর পঞ্চশিখ–এর দ্বারা সাংখ্যশাস্ত্র নানাভাবে বহু শিষ্যের মধ্যে প্রচার হয়েছিলো।

পঞ্চশিখ–এর কাছ থেকে শিষ্যপরম্পরাক্রমে মুনি কপিল প্রণীত এই সাংখ্যশাস্ত্র ভালোভাবে জেনে ঈশ্বরকৃষ্ণ আর্য্যা ছন্দে 'সাংখ্যকারিকা' নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তা–ই এখন পর্যন্ত সাংখ্য সম্প্রদায়ের প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। সাংখ্যদর্শনের পরিচয় প্রসঙ্গে সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেন–

'এতৎ পবিত্রমগ্র্যাং মুনিরাসুরয়েহনুম্পয়া প্রদদৌ।
আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তে চ বহুধা কৃতং তন্ত্রম্ ।। (সাংখ্যকারিকা–৭০)
***অর্থাৎ**: কপিল মুনি দয়াপরবশ হয়ে এই পবিত্র ও সর্বোৎকৃষ্ট (জ্ঞান) আসুরিকে প্রদান করেন, আসুরিও পঞ্চশিখকে (এই জ্ঞান দান করেন) এবং তার (অর্থাৎ পঞ্চশিখ) দ্বারা সাংখ্যশাস্ত্র বহুভাবে শিষ্য মধ্যে প্রচার হয়েছিলো।*

সাংখ্যদর্শন কতোটা প্রাচীন তা নিয়ে বহুমত থাকলেও এর প্রাচীনত্ব নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য শ্র"তি, স্মৃতি, পুরাণ ইত্যাদিতে সাংখ্য দর্শনের বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আনুমানিক (আজ বাংলা ১৪৩০ সনের বৈশাখ মাস হইতে) প্রায় ২৯০০ বছর আগে কপিল একজন খ্যাতনামা ঋষি এবং সেই উপনিষদে তাঁর দর্শনের স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। ভাগবতে কপিল মুনিকে চব্বিশজন অবতারের একজন বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে তাঁর পিতার নাম কর্দম ঋষি এবং মাতার নাম দেবহুতি। আবার মহাভারতে কপিল ও আসুরির সাংখ্যমতের উল্লেখ পাওয়া যায় ভালোভাবেই। মহাভারতের শান্তিপর্বে আচারজ্ঞ পিতামহ ভীষ্মের জবানিতে সাংখ্যমত সম্পর্কিত যে দীর্ঘ উদ্‌ধৃতি রয়েছে, তার খানিকটা এরকম–

'তত্র পঞ্চশিখো নাম কাপিলেয়ো মহামুনিঃ।
পরিধাবন্মহীং কৃৎস্নাং জগাম মিথিলামথ।। (শান্তিপর্ব: ২১৫/৬)
***অর্থাৎ** : সেই সময়ে কপিলানাম্নী কোন ব্রাহ্মণীর পুত্র মহর্ষি পঞ্চশিখ সমগ্র পৃথিবী পর্যটন করে পরে মিথিলানগরে এলেন।*

ঋষীণামাহুরেকং যং কামাদবসিতং নৃষু।
শাশ্বতং সুখমত্যন্তমন্বিচ্ছন্তং সুদুর্ল্লভম্ ।। (শান্তিপর্ব: ২১৫/৮)
***অর্থাৎ** : সেই যে পঞ্চশিখ ঋষিদের মধ্যে অদ্বিতীয় ও মনুষ্যমধ্যে সকল কামনা থেকে বিরত ছিলেন এবং নিত্য, অত্যন্ত ও অতিদুর্লভ নির্বাণমুক্তি কামনা করতেন, তা সেকালের লোকেরা বলতো।*

যমাহুঃ কপিলং সাংখ্যাঃ পরমর্ষিং প্রজাপতিম্ ।
স মন্যে তেন রূপেণ বিস্মাপয়তি হি স্বয়ম্ ।। (শান্তিপর্ব: ২১৫/৯)

অর্থাৎ : *সাংখ্যমতাবলম্বীরা যাঁকে মহর্ষি ও প্রজাপতি কপিল বলেন; আমি মনে করি, স্বয়ং সেই কপিলই পঞ্চশিখরূপে এসে জ্ঞানালোকের প্রভাবে সকল লোককে বিস্ময়াপন্ন করছেন; তাও তখন কেউ কেউ বলতো।*

.

তমাসীনং সমাগম্য কাপিলং মণ্ডলং মহৎ।
পুরুষাবস্থমব্যক্তং পরমার্থং ন্যবেদয়ৎ।। (শান্তিপর্ব : ২১৫/১১)

অর্থাৎ : *একদা আসুরি আপন তপোবনে উপবিষ্ট ছিলেন; এমন সময়ে সাংখ্যমতাবলম্বী বহুতর মুনি সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে পুরুষরূপ অব্যক্ত, পরম পদার্থ বলবার জন্য নিবেদন করলেন।*

.

যত্তদেকাক্ষরং ব্রহ্ম নানারূপং প্রদৃশ্যতে।
আসুরির্মণ্ডলে তস্মিন্ প্রতিপেদে তদব্যয়ম্ ।। (শান্তিপর্ব : ২১৫/১৩)

অর্থাৎ : *সেই যে একাক্ষরময় ব্রহ্ম নানাপ্রাণীতে নানারূপে দৃষ্ট হন, সেই অবিনশ্বর ব্রহ্মের বিষয় আসুরি সেই মুনিগণের নিকট বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করেছিলেন।*

এতন্মে ভগবানাহ কাপিলেয়স্য সম্ভবম্ ।
তস্য তৎ কাপিলেয়ত্বং সর্ববিত্ত্বমনুত্তমম্ ।। (শান্তিপর্ব : ২১৫/১৬)

অর্থাৎ : *ভগবান্ মার্কণ্ডেয় এই পঞ্চশিখের উৎপত্তি এবং তাঁর কাপিলেয়ত্ব ও সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বজ্ঞত্ব বিষয় আমাকে বলেছিলেন।*

মহাভারতে সাংখ্যমতের বিস্তৃত আলোচনা থেকে এ দর্শনের প্রভাব ও প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায় অবশ্যই। অন্যদিকে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের প্রাচীন সূত্রগ্রন্থ 'চরক–সংহিতা'র দার্শনিক অনুক্রমে এই সাংখ্যশাস্ত্রেরই ভিত্তি পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

'সত্ত্বমাত্মা শরীরঞ্চ ত্রয়মেতাত্রিদণ্ডবৎ।
লোকস্তিষ্ঠতি সংযোগাৎ তত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।।
স পুমাং শ্চেতনং তচ্চ তচ্চাধিকরণং স্মৃতম্ ।
বেদস্যাস্য তদর্থংহি বেদোহয়ং সম্প্রকাশিতঃ।। (চরক–সংহিতা : প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা–৬)

অর্থাৎ : *মন, আত্মা ও শরীর– এরা ত্রিদণ্ডের ন্যায়। অর্থাৎ যেমন তিনটি দণ্ডের সংযোগে একটি ত্রিদণ্ড (ত্রিপদী বা তেপায়া) প্রস্তুত হয় এবং তার উপর দ্রব্যাদি রাখা যায়, তেমনি মন, আত্মা ও শরীরের সংযোগেই লোক সকল জীবিত রয়েছে এবং এই সংযোগের উপরই কর্মফল, বিষয়বাসনা সুখ, দুঃখ, জ্ঞানাজ্ঞান প্রভৃতি সবকিছু নির্ভর করছে। এদের সংযুক্ত অবস্থাকেই পুরুষ বলে। এই পুরুষই চেতন, তিনিই সুখ দুঃখাদির আধার এবং এরই জন্য এই আয়ুর্বেদ প্রকাশিত হয়েছে।*

বৈদিক সংস্কৃতিতে সকল শাস্ত্রের সার বলে কথিত প্রাচীন মনুস্মৃতি বা মনুসংহিতায়ও সাংখ্যদর্শনের প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। মূলত মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের দার্শনিক প্রপঞ্চটাই সংখ্যদর্শন ভিত্তিক। যেমন–

'তেষামিদন্তু সপ্তানাং পুরুষাণাং মহৌজসাম্ ।
সূক্ষ্মাভ্যো মূর্তিমাত্রাভ্যঃ সম্ভবত্যব্যয়াদ্ব্যয়ম্ ।। (মনুসংহিতা : ১/১৯)
***অর্থাৎ** : মহত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব এবং পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটি অনন্তকার্যক্ষম শক্তিশালী পুরুষতুল্য পদার্থের সূক্ষ্ম মাত্রা থেকে এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে; অবিনাশী পুরুষ (পরমাত্মা) থেকে এই রকম অস্থির জগতের উৎপত্তি হয়েছে।*

.

আদ্যাদ্যস্য গুণং ত্বেষামবাপ্নোতি পরঃ পরঃ।
যো যো যাবতিথশ্চৈষাং স স তাব গুণঃ স্মৃতঃ।। (মনুসংহিতা : ১/২০)
***অর্থাৎ** : আকাশাদি পঞ্চভূতের মধ্যে পর–পর প্রত্যেকে পূর্ব–পূর্বের গুণ গ্রহণ করে। এদের মধ্যে যে সৃষ্টিক্রমে যে স্থানীয়, সে ততগুলি গুণ পায়। –প্রথম ভূত আকাশের ১ গুণ,- শব্দ। দ্বিতীয় ভূত বায়ুর ২ গুণ,- শব্দ ও স্পর্শ। তৃতীয় ভূত অগ্নির ৩ গুণ– শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ। চতুর্থ ভূত জলের ৪ গুণ– শব্দ, স্পর্শ, রূপ এবং রস। পঞ্চম ভূত পৃথিবীর ৫ গুণ– শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ।*

আজ (বাংলা ১৪৩০ সনের বৈশাখ মাস হইতে) প্রায় ২৪০০ বছর আগে বিখ্যাত প্রামাণিক গ্রন্থ কৌটিল্য প্রণীত 'অর্থশাস্ত্র'–এ সাংখ্যদর্শনের প্রশস্তি দেখা যায়। কৌটিল্য সাংখ্যশাস্ত্রকে অনুমোদিত বিদ্যাচতুষ্টয়ের অন্যতম আন্বীক্ষিকীর অন্তর্গত শাস্ত্র হিসেবে বর্ণনা করেছেন–

'সাংখ্যং যোগো লোকায়তং চেত্যান্বীক্ষিকী'। (অর্থশাস্ত্র: ১/২/২)।
***অর্থাৎ** : সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত– এই তিনটি শাস্ত্র উক্ত আন্বীক্ষিকী–বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত।*

কৌটিল্যের এই বিদ্যাচতুষ্টয় হলো–

'আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি বিদ্যাঃ'। (অর্থশাস্ত্র: ১/২/১)।
***অর্থাৎ** : আন্বীক্ষিকী (হেতুবিদ্যা বা তর্কবিদ্যা বা মোক্ষদায়ক আত্মতত্ত্ব), ত্রয়ী (ঋক্–যজুঃ–সামবেদাত্মক বেদ–বিদ্যাসমুদায়), বার্তা (কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য বিষয়ক বিদ্যা) এবং দণ্ডনীতি (অর্থাৎ রাজনীতি বা নীতিশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র)।*

কৌটিল্যের মতে আন্বীক্ষিকী সকল বিদ্যার প্রদীপস্বরূপ–

প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্বকর্মণাম্ ।
আশ্রয়ঃ সর্বধর্মাণাং শশ্বদান্বীক্ষিকী মতা।। (অর্থশাস্ত্র: ১/২/২)।
***অর্থাৎ** : আন্বীক্ষিকীবিদ্যা (অপর-) সকল বিদ্যার প্রদীপস্বরূপ (মার্গদর্শক), সকল কর্মের (অর্থাৎ কর্মসাধনের পক্ষে) উপায়তুল্য, সকল (লৌকিক ও বৈদিক-) ধর্মের আশ্রয়স্বরূপ বলে সর্বদা পরিগণিত হয়ে থাকে।*

এসব প্রাচীন সাহিত্যে সাংখ্যমতের বহুতর উল্লেখ থেকে অনুমান করাটা অসম্ভব নয় যে, অন্তত (আজ বাংলা ১৪৩০ সনের বৈশাখ মাস হইতে) ২৯০০ বছরের পূর্ব থেকেই ভারতীয় দর্শন জগতে সাংখ্যদর্শনের জোরালো উপস্থিতি ছিলো। এবং প্রাচীন পুঁথিপত্রে এ–দর্শনের প্রভাব এতো ব্যাপক ও বিশাল যে, সাংখ্যমতের পেছনে অতি সুদীর্ঘ যুগের ঐতিহ্য স্বীকার না করলে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না বলে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ভারতীয় দর্শন' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন। ফলে সাংখ্যদর্শনকে খুবই প্রাচীন বলে স্বীকার করা অমূলক হবে না। আধুনিক বিদ্বানদের কেউ কেউ সাংখ্যকে গৌতম বুদ্ধের চেয়ে অনেক প্রাচীন কালের দর্শন বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তাঁদের মতে সাংখ্য–সম্প্রদায়ের প্রবর্তক কপিলের নাম থেকেই বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলাবস্তুর নামকরণ হয়েছিলো।